শাপমুক্তি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট রতি প্রেস হইতে
শ্রীনীরোদচন্দ্র ঘোষ
দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি আমার **গল্পমাল্য** গ্রন্থে এবং বাকীগুলি অধুনালুপ্ত **মানসী ও মর্ম্মবাণীর** পৃষ্ঠায় এতদিন নিদ্রিত ছিল—এক্ষণে তাহাদের **শাপমুক্তি** ঘটিল। ইতি—
সন ১৩৩৮ সাল ৯ই চৈত্র শ্রীশ্রীদোল-পূর্ণিমা।

৪৫।১।এ বীডন্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২২শে মার্চ্চ ১৯৩২।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ"—

পরমারাধ্যতম

পিতৃদেব

স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

—শ্রীচরণোদ্দেশে—

শাপমুক্তি	...	...	...	১
মৃত্যু অভিসার	...	...	...	৩৭
আমার জীবন	...	...	...	৫৮
ভিক্ষুক	...	...	...	৭৯
গৌরী	...	...	...	৮৮
ভাই	...	...	...	১২৩
রক্তের টান	...	...	...	১৪৬
পুনর্মিলন	...	...	...	১৬৯

শাপমুক্তি

সাইমন্ ছিল জাতিতে মুচি। ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকিত। ছেলে পিলেও দুটি তিনটি ছিল।

সাইমন্ বড় গরীব। রোজগার সে যাহা করে তাহা অতি সামান্য, কোন রকমে টায়ে-টায়ে তাদের পেটের ভাতটাই চলে মাত্র। পরণের কাপড়ের কথা উঠিলেই মুস্কিল। সাইমন্ প্রতি বৎসর পেটে না খাইয়া কিছু কিছু করিয়া জমায়—শীতকালে একটি গরম আংরাখা কিনিবে বলিয়া, কিন্তু সেটা কোন বৎসরই আর ঘটিয়া উঠেনা। সেই শততালিযুক্ত পুরাণো খসখসে দুর্গন্ধ জামাটাতেই বৎসরের পর বৎসর শীত কাটিয়া যাইতেছে।

এবার শীতের কিছু আগে হইতেই সে একটা গরম আংরাখা কিনি-বার বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। যেমন করিয়া হোক্ কিনিবেই। তার নিজের কাছে কিছু জমিয়াছিল, স্ত্রীর কাছেও তিন টাকা সাত পয়সা

হইয়াছিল—আর খরিদ্দারদের কাছেও কিছু সে পাইবে, সুতরাং এবার আর গরম জামা না হইয়া যায় না।

আজ সকালেই সে আংরাখার জন্য কাপড় কিনিয়া আনিবে স্থির করিল। বেশ শীত পড়িয়াছিল, পত্নীর পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া জ্যাকেট, কোটের নীচে আঁটিয়া, ডাল কাটিয়া একগাছা লাঠি তৈরি করিয়া লইয়া, সাইমন্ বাহির হইল। মনে মনে ঠিক করিল যে তার স্ত্রীর দরুণ তিন টাকা, আর তার খরিদ্দারের কাছে সাড়ে চার টাকা পাওনা আছে, এই সাড়ে সাত টাকাতে তার খুব ভাল একটি জামা নিশ্চয়ই হইবে, যদি তারও উপর কিছু লাগে তো নিজের জমা হইতে দিবে।

সহরে আসিয়াই সাইমন প্রথমে তাহার একজন খরিদ্দারের বাড়ী গেল! গৃহস্বামী বাড়ী ছিলেন না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী জানাইলেন যে, তাঁর স্বামী বাড়ী আসিলেই তিনি তাঁহাকে আগে সাইমনের টাকা শোধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিবেন; আর দু'একদিনের মধ্যেই যাহাতে সাইমন তাহার প্রাপ্য টাকা পায়, তাহার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিবেন। মাত্র দু'টি দিন সবুর করিতে হইবে, দুটি দিন।

অন্য এক খরিদ্দারের বাড়ী গেল। সে শপথ করিয়া বলিল যে, সে আজ কপর্দ্দক-শূন্য।

পথে এক জায়গায় একটা কায মিলিল। এক জনের জুতায় তাফশোল লাগাইয়া দিয়া সাইমন্ আট আনা পারিশ্রমিকও উপার্জ্জন করিল।

খরিদ্দারের কাছে বাকী আদায় হইল না বলিয়াও সাইমন্ দমিল না। ভাবিল—"কাপড়টা না হয় ধারেই কিনে নিয়ে যাই।"

দোকানী ধার দিল না। বলিল—"ফ্যালো কড়ি মাখো তেল—ধার ধোর বুঝি না বাবা! টাকা আদায় কর্‌তে কে তোমার দোরে রোজ রোজ ধন্না দেবে? তুমি কি জান না—বিলেৎ আদায় করা কত মুস্কিল?"

সাইমন্ ফিরিল, তার কাপড় কেনা আর হইল না। একজন এক জোড়া বুট জুতা দিল, মেরামত করিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হইবে। সাইমন সেই বুট জুতা-জোড়াটি দুলাইতে দুলাইতে বিষণ্ণ মনে বাড়ীর পথে ফিরিল; এত করিয়াও গরম জামা আর হইল না। একি কম আপশোশ?

মনটা খুবই খারাপ। পথে আসিতে আসিতে একটা মদের দোকানে ঢুকিয়া সে সকাল বেলার উপার্জ্জিত আট আনার মদ খাইয়া, বাড়ীপানে চলিল। মনটা কতক ভাল হইল, বুকের বোঝাটাও অনেক পাতলা হইয়া গেল, শীত বোধও কম হইতে লাগিল। সে খোস্-মেজাজে জোরে জোরে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে, হাতের জুতা-জোড়াটি দুলাইতে দুলাইতে, আপন মনে চলিতে লাগিল।

"বাঃ—এই কোর্ত্তাতেই তো বেশ গরম হচ্ছে! তবে আর গরম কোর্ত্তার দরকার কি? কি হবে গরম কাপড়ে?…কিসের অভাব আমার?…ভাবনাই বা কি?…আমি ত গরম জামা না কিনেও বেশ চালাতে পারি দেখ্‌ছি!…দুঃখ কিসের?…না, না, দুঃখ আছে বৈ কি—ঐ বৌটা। ওটা সারাদিন ভারি খিট্ খিট্ করে! হয় তো বাড়ী গিয়ে দেখবো সে তোফা খেয়ে দেয়ে হেঁসেল তুলে বসে আছে। আমার জন্যে একটা দানাও ফেলে রাখেনি।"

—এমনি নানা রকম আবোল-তাবোল ভাবিতে ভাবিতে সাইমন

শাপমুক্তি

একবারে গির্জ্জা ঘরের কোণের কাছে, যেখানে রাস্তাটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই মোড়ের মাথায় আসিয়া হাজির !

হঠাৎ রাস্তা হইতে গির্জ্জার পিছনে তার নজর পাড়ল। দেখিল একটা সাদা কি যেন বসিয়া আছে ! বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল—ভাল করিয়া বোঝা গেল না, ঠিক ওটা কি !

"ওটা কি ওখানে ?...সাদা পাথর তো ওখানে নেই ?...তবে বুঝি গরু ?...গরুই বা কি করে হবে ?...মাথাটা দেখা যাচ্ছে—ঠিক মানুষের মাথার মত !...মানুষ তবে ওখানে অমন করে বসে কি করচে ?"

সাইমন দেখিবার জন্য গির্জ্জার ধারে সরিয়া গেল !..."ওমা, তাইত ! এ তো মানুষই বটে !...সত্যিই তো মানুষ !...মানুষটা কি মরা, না জ্যান্ত ?...গির্জ্জার দেওয়ালে একবারে হেলে পড়ে'—একি ?"—সাইমন খুব বিস্মিত হইয়া সেই মানুষটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

"হয়েছে, বুঝিচি—কেউ ও লোকটাকে মেরে, সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে পালিয়েছে !—বোঝা গেছে—আর কাছে গিয়ে কাজ নেই বাবা। গেলেই এখুনি মস্ত মুস্কিল...সরে পড়াই ঠিক...আমি যেন ও সব দেখিনি ! সেই ভাল !"

—ভাবিয়াই সাইমন্ মোড় ফিরিল। খানিক দূরে গিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। লোকটাকে আর দেখা গেল না। না দেখিতে পাইয়া সে দ্বিগুণ কৌতুহলী হইয়া কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে দেখে যে, সে লোকটা একটু সরিয়া বসিয়া, সাইমনের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

ভয়ে সাইমনের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। সে ভগবানের নাম

জপিতে লাগিল। কিন্তু এখন কি করা যায়—এই তাহার প্রধান চিন্তা হইল। লোকটার কাছে যায়, না দৌড়িয়া পলায়?

ভাবিল—"যদি এখন ওর কাছে যাই, তাহলে তো দেখছি আর রক্ষা নাই! কে জানে বাবা, ও কেমন লোক। ও নিশ্চয়ই কোন বদমাইস, তা নৈলে ওখানে অমন করে বসে থাক্‌বে কেন? উঁহু, ভাল বোধ হচ্ছে না। হয় তো যেমনি আমি ওর কাছে যাব, অমনি ও আমার টুঁটিটা চেপে ধর্‌বে। আমায় টুঁ শব্দটা পর্য্যন্ত কর্‌তে দেবে না! আর ধর, টুঁটি না-ই ধরলো। আমি ওখানে গিয়ে কি কর্‌ব? ও ন্যাংটা ওকে আমি কি করে এ অবস্থায় সাহায্য কর্‌তে পারি, বল? ওর উপকার কর্‌তে, আমি আমার এই সবেমাত্র সম্বল পোষাকটি তো আর দান কর্‌তে পারিনে! কি হবে তখন গিয়ে?"

সাইমন্ দ্রুতপদে বাড়ী পানেই ফিরিল। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতেই আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কে যেন কহিল—

"এ কি সাইমন্! এ তুমি কচ্চ কি? ওখানে একটা লোক মরে যাচ্ছে, আর তুমি কেবল তোমার নিজের স্বার্থটুকুরই হিসেব কর্‌চ? তুমি কি এতই বড় লোক? তোমার কি কখনও কোন জিনিষ ক্ষয় হবে না, লোক্‌সান যাবে না? ছি, সাইমন্—এ তুমি ভাল কায কর্‌চ না!"

সাইমন্ ফিরিল, একবারে সোজা গির্জ্জা ঘরের কোণে সেই লোকটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাছে আসিয়া সাইমন্ দেখিল যে, ইহার বয়স নিতান্ত কম, বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি! কৈ গায়েও তো কোন রকম মা'র ধোর বা

অস্ত্রাঘাতের দাগ নাই! তবে দেখিয়া মনে হইল, সে যেন শীতে কাঁপিতেছে, আর খুব ভয়ও পাইয়াছে!

সে যেমন দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তেমনি অটল অবিচলিত হইয়া বসিয়াই রহিল। সাইমন্‌কে এবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না! বোধ হইল— সে এত দুর্ব্বল যে চোখ মেলিয়া চাহিতেও যেন তার কষ্ট হইতেছিল।

সাইমন্ তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। মাথা তুলিয়া চোখ খুলিয়া সে সাইমনের মুখপানে একবার চাহিল।

যেমন চারি চক্ষের মিলন—অমনি এই লোকটির জন্য সাইমনের ভিতরটা এক অপূর্ব্ব করুণায় ভরিয়া উঠিল। সাইমন্ আর থাকিতে পারিল না। হস্তস্থিত বুট-জোড়াটি, নিজের ওয়েষ্ট কোট ও সেই পুরাণ গরম জামাটি হঠাৎ সেই অপরিচিতকে দিয়া বলিল—"নাও দিকিন্, এইগুলো পর'। পরে' আমার সঙ্গে চলে এস! নাও, নাও!"

এই বলিয়া সাইমন্ তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া পায়ের উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। সাইমন্ সেই স্বল্প অবসরে তাহার সুগঠিত দেহ, শুভ্র বর্ণ, এবং করুণ মুখখানি দেখিয়া মনে মনে খুবই পুলকিত হইল; তার বুকের মধ্যেও স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিল! সে এত দুর্ব্বল যে জামার মধ্যে হাত ঢুকাইবার বল পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। সাইমন্ তাহাকে জামা পরাইয়া, বোতাম আঁটিয়া দিয়া, নতজানু হইয়া সেই জুতাজোড়াটি পায়ে চড়াইয়া দিয়া, সস্নেহে বলিল—"ব্যস্, এইবার এসো ভাই।...চলতে পারবে না? আচ্ছা, আস্তে আস্তে

একটু চলে' রক্তটা একবার গরম করে নাও দিকিন, তা হলেই হবেখ'ন্।"

নিজের মাথার ময়লা ছেঁড়া টুপিটাও এই লোকটির মাথায় পরাইয়া দিবার জন্য খুলিয়া ভাবিল—"না, এ ছেঁড়া টুপি আর ওরকম কালো কালো বাব্‌ড়ি চুলের ওপর চাপিয়ে কায নেই। এ আমার মাথাতেই থাক্—"

অপরিচিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার সাইমনের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নাই।

"কি গো তুমি কি বোবা? কথা বল্‌চ না যে। তা মরুক্ গে যা হোক্‌গে—এখন চল বাড়ী যাই—এখানে তো এই শীতে রাত্রিবাস করা যাবেনা!—তা যদি বেশী দুর্ব্বল বলে' বোধ কর তো আমার এই লাঠি গাছটাই নাও না হয়, এতে ভর দিয়ে এস! এখানে তো আর দাঁড়ানো যায় না। চল!"

—বলিয়াই সাইমন্ পা বাড়াইল। অপরিচিতও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, তুমি আস্‌চ কোথা থেকে?

"অনেক দূর থেকে!"

"তা তো বুঝতেই পার্‌চি! এর আশপাশের সব গাঁয়ে আমার তো আর কেউ অচেনা নেই! তা, তুমি ও গির্জ্জাঘরের পিছনে এসে পড়্‌লে কি করে?"

"সেটা বল্‌তে পারব না।"

"কেউ কি তোমায় মেরেছে ?"

"না, কেউ মারেনি। ভগবান্ আমায় মেরেচেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তা তো বুঝ্‌তেই পারচি। ভগবানই তো যত নষ্টের জড়! তবু কোনও একটা বিশেষ জায়গা হতে তো তুমি আসচো? না, তা-ও না? আর যাবেই বা কোথা?"

"যেখানে হয়—যাবারও আমার কোনও স্থিরতা নেই।"

এ উত্তরে সাইমন্ চমকিয়া উঠিল।—ভাবিল—"জোচ্চোর বলেও তো বোধ হচ্ছে না। গলার আওয়াজ যার এত মিঠে, সে কি কখনও প্রতারণা করতে পারে?...তবে এ কোন কথা খোলাশা করে বলে না কেন? এ কি অদ্ভুত জীব?"

সাইমন ঠিক করিল—হয় তো জীবনের এ সব গোপন কথা ইহার কাহাকেও বলিবার ইচ্ছা নাই।

"বেশ—তা চল এখন আমার সঙ্গে আমার বাড়ী। শীতের হাত হতে তো আগে নিস্তার পাও—তারপর সে পরের কথা পরে হবে।"—বলিয়া এই নবীন সাথীটির পাশে পাশে সাইমন চলিতে লাগিল।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস সাইমনের কামিজ ফুঁড়িয়া তাহার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত জমাইয়া দিতেছিল। সরাব যেটুকু খাইয়াছিল, তাহার নেশা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কাযেই ঠাণ্ডাটা সাইমনের তীব্রতর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

..."খুব কায করলাম যা হোক্! শীতের জন্যে গরম কোর্ত্তা করাতে বাড়ী হতে বের হয়ে, যা-ও একমাত্র একটা কোট সম্বল ছিল, খয়রাৎ করে, একটা উলঙ্গ রাস্তার লোক ধরে' নিয়ে বাড়ী ফির্‌চি! বাঃ বেশ

তো !···মাত্রিনা কিন্তু এতে নিশ্চয়ই খুসী হবে না !···সে তো এই দেখে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বে। তা বুঝ্‌তেই পারচি।”

স্ত্রীর কথা মনে পড়াতেই সাইমন্‌ যেন পাঁচ হাত দমিয়া গেল। কাতর নয়নে একবার সাথীটির পানে চাহিল, গির্জ্জাপ্রাঙ্গণের সেই চারি চক্ষের মিলন মনে পড়িল। অমনি সাইমনের হৃৎপিণ্ড এক অপূর্ব্ব অহেতুকী পুলক-প্রীতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সাইমনের স্ত্রীর কাযকর্ম্ম সেদিন খুব সকাল সকালই সারা হইয়া গিয়াছিল। দুই বাল্‌তি জল তুলিয়া রাখিয়া, আগুন জ্বালাইবার জন্য কাঠ কিছু কাটিয়া, ছেলেপিলেকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া, মুচিনী ভাবিল—“রান্না কর্‌ব নাকি ?···নাঃ, আর পারি নে শরীরটা বড় এ’লে পড়েছে···সে নিশ্চয় খেয়েই আস্‌বে···এই একখান রুটি থাক্‌লো মোটে কাল সকালবেলাকার জন্যে···এতে কাল হবে না ?···সকালবেলা কি ?··· কাল সারাদিনই তো যাবে···মস্ত রুটি যে ? ঘরে ময়দাও কিছু আছে, এতেই শুক্রবার পর্য্যন্ত চলে যাবে কোনও রকমে।”

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে ঘরকন্না সারিয়া, মাত্রিনা সাইমনের একটা জীর্ণ কামিজে তালি লাগাইতে বসিয়া গেল। সেলাই করে আর ভাবে···“না জানি কেমন কাপড়ই বা সে কিনে আন্‌চে ! ভগবান, এখন ঠকে না এলে বাঁচি। আহা সে বড় ভালমানুষ,··· একটা পাঁচ বছরের ছেলেও যে তাকে ঠকাতে পারে। তাকে ঠকান কি শক্ত ? সাড়ে সাতটা টাকা—নিতান্ত অল্প কথা তো নয়, সাড়ে সাত টাকা ! আহা বেচারী শীতে কি কম কষ্টটা পাচ্ছে ? আমার ছেঁড়া জ্যাকেটটা আবার গায়ে দিয়ে গেছে !—এখন আমি

বেরোই কি করে? বোকা, অতি বোকা—কি কচ্চে সে সারাদিন? এখনো যে ফেরে না।"

সাইমনের পদশব্দ শোনা গেল। মাত্রিনা হাতের সেলাই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দেখিল সাইমন্ একা আসে নাই, আর একজন লোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তার মাথায় টুপি নাই, অথচ পায়ে ভাল একজোড়া বুট।

মাত্রিনা বুঝিল, তাহার স্বামী খুব মদ খাইয়া আসিয়াছে। অস্ফোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল—"ঠিক, যা ভেবেচি!"

তারপর খানিকক্ষণ চাহিয়া যখন মাত্রিনা দেখিল যে নূতন জামা করানো দূরের কথা, সাইমনের গায়ে তার নিজের কোর্তাটা পর্য্যন্ত নাই, তখন তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

—"দেখ দেখি, দেখ দেখি একবার হতভাগা মিন্সের কাণ্ড! রাস্তার লোকের সঙ্গে বসে সারাদিন মদ মেরে—আবার তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসা হয়েচে? এখনো আশা মেটে নি?"

কি করে? মাত্রিনা উভয়কেই পথ ছাড়িয়া বাড়ী ঢুকিতে ইশারা করিল, কোন কথা বলিল না। কিয়ৎক্ষণ সে এই মলিন কৃশ আগন্তুকের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, ইহার গায়ে কামিজ পর্য্যন্ত নাই। আগন্তুক মাটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া মাত্রিনা সিদ্ধান্ত করিল—ইহারা যে গুরুতর কিছু একটা করিয়া আসিয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই—তাই ভয় পাইয়াছে।

শাপমুক্তি

মাত্রিনা মুখ ভার করিয়া, রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে ষ্টোভের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল—দেখি কি করে এরা!

সাইমনের মুখটি চুণ। সে অপরাধী ছাত্রের মত গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসন্ন বিপদাশঙ্কায় সম্মুখের বেঞ্চিখানায় গিয়া আস্তে আস্তে বসিয়া বলিল —"বলি, দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি? দুটো খেতে টেতে দেবে? ক্ষিধেয় যে প্রাণ বেরিয়ে গেল।"

পত্নী দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে করিতে কি বলিল, তাহা সাইমন্‌ বুঝিতে পারিল না। মাত্রিনা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়াই ঘন ঘন উভয়ের মুখপানে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিল।

এ দৃষ্টির অর্থ সাইমন্‌ বিলক্ষণই বুঝিল। কিন্তু কি করে?—তাহার যে উভয়-সঙ্কট। যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবটা দেখাইয়া, আগন্তুকের হাতটি ধরিয়া কাছপানে টানিয়া বসাইবা বলিল—"বোস', ভাই বোস'—দাঁড়িয়ে রইলে যে? কিছু খাও।"

আগন্তুক নীরবে সেই কাষ্ঠাসনে বসিল।

"বলি, ও—গো। আজ রান্নাবান্না কিছু হয় নি না কি?"

এইবার ঝড় উঠিল।

—"রান্না হবে না কেন? রান্না হয়েছে বৈ কি কিন্তু সে তোমার জন্যে হয় নি। আ মর্‌ ডেক্‌রা। শুধু তো মদ খেয়ে এসো নি, নিজের বুদ্ধি সুদ্ধি পর্য্যন্ত খেয়ে এসেচ। কথা শোন' একবার হতভাগার। মরণ নেই? শীতের জন্যে গরম কাপড় কিনতে বেরিয়ে, যা'ও একটা পুরোণো ধূরোনো জামা ছিল সেটাও বিলিয়ে দিয়ে—রাস্তা থেকে এক ন্যাংটা মাতালকে এনে ঘর ঢুকিয়ে, কোন্‌ মুখে খেতে চাইচিস্‌? আ

মরণ থালভরা। বল্‌তে লজ্জা করে না? মাতাল ফাতালদের জন্যে এখানে খাবার টাবার নেই।"

"দেখ, সাবধান হয়ে কথা বোলো,—ভাল হবে না, বলে রাখ্‌চি।—জান এ লোকটি কে?"

"রেখে দিগে তোর লোকটিকে! হ্যাঃ—আগে আমার টাকা কি করলি বল্‌।"

সাইমন্‌ তাহার পেণ্টুলনের পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া ঠং ঠং ঠং করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ঐ নে তোর টাকা। খদ্দেররা আজ কেউ টাকা দিতে পার্‌লে না।"

ইহাতেও মাত্রিনার রাগ পড়িল না। সে কেন তাহার একমাত্র পুঁজি এই জামাটি এই লোকটাকে দিল? আর পাওনা টাকা, তাই বা আদায় না হইবে কেন? পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে কি আর টাকাগুলো উশুল্‌ হইত না?

মাত্রিনা টাকা তিনটা কুড়াইয়া বাক্সে রাখিতে রাখিতে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল—"বেশ কথা। তা খাবার এখানে কিছু নেই। তুমি যে মনে কর্‌চ যে রাস্তার মাতাল ধরে ধরে এনে বাড়ীতে পূরবে, আর আমি তাদিকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াব—সেটি হচ্চে না। লোক দেখ্‌লেই চেনা যায়, কে কেমন। ভাল লোকই এ যদি হবে, তা হলে কি আর এমনি ন্যাংটা হয়ে পথে পথে বেড়ায়? আমি কি আর তোমার এ সব চালাকি বুঝি না মনে করেচ?—কে এ?"

"সেই কথাই তো বল্‌চি! একটু স্থির না হলে মাথামুণ্ডু কী শুন্‌বে? আমি গির্জ্জে ঘরের পাশ দিয়ে আস্‌ছিলাম. দেখি এই লাকটি সেই

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একবারে উলঙ্গ অবস্থায়, এই দারুণ শীতে মর-মর।
—আমি যদি একে না দেখতাম তো এই রাত্রেই যে এ মরে যেত!—
ভগবান্ আমাকে এর কাছে যেতে বল্লেন! আমি গেলাম! যা' পারলাম, নিজের পোষাক খুলে একে দিলাম, দিয়ে এখন বাড়ী নিয়ে এসেচি।
—নৈলে লোকটা বেঘোরে মারা যেত।—বুঝলে? একটু ঠাণ্ডা হও, মাত্রিনা, একটু ধীর হও। চব্বিশ ঘণ্টা অমন রণচণ্ডী হয়ে, ফাল্ হয়ে থেকো না! রাগতে নেই, রাগা পাপ! আমরা সবাই একদিন মরবো
—এটা যেন মনে থাকে।"

মাত্রিনা কি বলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল।

অপরিচিতের পানে সে আর একবার চাহিল। দেখিল, সে হাঁটুর উপর হাত দুটি যোড় করিয়া, নত নয়নে ঠিক সেই ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এইবার মাত্রিনা একটু নরম হইল।

সাইমন্ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বুক থেকে দয়া মায়া কি ভগবান্ একেবারে কেড়ে নিয়েছেন, মাত্রিনা?"

মাত্রিনা এ প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দিল না। সে একদৃষ্টে সেই নবাগত লোকটির পানেই চাহিয়া রহিল। অতিথি হঠাৎ মাথা তুলিয়া মাত্রিনার পানে চাহিল। মাত্রিনার হৃদয় স্নেহ করুণায় এবং অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। সেখানে আর সে দাঁড়াইতে পারিল না। একটি শব্দ পর্য্যন্ত তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। আস্তে আস্তে মাত্রিনা গিয়া উনান জ্বালাইল এবং আহারের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অত্যল্পকাল মধ্যেই মাত্রিনা রন্ধনাদি করিয়া, খাবার পরিবেষণ করিয়া ডাকিল—"এস খাবে এস।"—কণ্ঠস্বর এবার কোমল স্নেহার্দ্র এবং অনুতপ্ত।

"এস ভাই, খাই গে, এস"—বলিয়া সাইমন্ অতিথিকে লইয়া গিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মাত্রিনা উভয়ের সম্মুখে বসিল। তাহার চক্ষু সেই হইতে এই সুকুমার কিশোর অতিথিকে ছাড়িয়া আর কোথাও ফিরিতে চাহিতেছিল না।

মাত্রিনার সমস্ত মাতৃস্নেহ এই হতভাগ্য সুন্দর মৌন কিশোরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অতিথির চিন্তা-তমসাচ্ছন্ন বিমর্ষ মুখমণ্ডলে একটা প্রফুল্লতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথাটি তুলিয়া মাত্রিনার মুখের দিকে চাহিয়া একবার একটু হাসিল।

ভোজন শেষ হইলে, মাত্রিনা একটু পূর্ব্বে সাইমনের যে কামিজটিতে তালি লাগাইতেছিল সেইটি এবং সিন্দুক খুলিয়া একটা পুরাতন পেণ্ট্‌লুন আনিয়া অতিথিকে দিয়া বলিল—"এই দুটো তুমি পর। তোমার কাপড় চোপড় তো কিছুই নেই! আপাততঃ এইতেই কায চালাও।—আর রাত্রে, এই বেঞ্চিতে সুবিধা হয় এখানেই, কিম্বা যদি গরম চাও তো রান্নাঘরে, যেখানে তোমার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ো। কেমন? এইবার তবে আমি যাই, শুইগে?"

অতিথি সেই কামিজ গায়ে দিয়া পায়জামাটি পরিয়া সাইমনের দেওয়া কোর্ত্তাটি খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া নীরবে সেই বেঞ্চির উপরেই শুইয়া পড়িল। মাত্রিনা কোর্ত্তাটি উঠাইয়া, বাতিটি নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিতে গেল।

মাত্রিনা সেই কোর্ত্তাটি মুড়ি দিয়া শুইল ; কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবল বারে বারে এই নবাগতের তরুণ ঢল্ ঢল্ মুখখানিই মনে পড়ে! সে চিন্তা যদি যায় তো ভাবে, কাল সকালে আহারের কি হইবে? যাহা ছিল সব তো খরচ হইয়া গেল। ময়দা আছে, তাই দিয়া না হয় আবার সে রুটিই তৈরি করিবে। কিন্তু এ সে কী করিল? সাইমনের বহু কষ্টের সেই তোলা পায়জামাটা আর কামিজটা—কামিজটা না হয় একটু পুরানোই হইয়াছিল—একেবারে এই কোথাকার কে লোকটাকে দিয়া ফেলিল? ছি ছি ছি—এটা সে অত্যন্ত খারাপ কার্য্য করিয়াছে। এখন উপায়? মাত্রিনার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেই তরুণ ঢল ঢল করুণ মুখখানি, সেই একটু সরল হাসি, সেই একান্ত নির্ভরের স্নিগ্ধ চাহনি!—মাত্রিনার হৃদয় অনুকম্পায় আনন্দে পুলকে স্নেহে ভরপুর হইয়া পড়িল!

প্রাতে উঠিয়া সাইমন্ দেখিল, তাহার স্ত্রী পাড়ায় কিছু ময়দা ধার করিতে বাহির হইয়াছে, ছেলেপিলেরা তখনও ঘুমাইতেছে, আর সে নবাগত একাকী তেমনি বিমর্ষ মুখটি নীচু করিয়া বেঞ্চিখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছে। তবে মোটের উপর কালকের চেয়ে আজ যেন তার মুখমণ্ডল সামান্য একটু—অতি সামান্য—প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর—তুমি কি কায কর্‌তে পার বল দেখি? খেতে পরতে হবে—তার একটা উপায় কর্‌তে হবে তো?"

"আমি যে কোন কাযই কর্‌তে পারি নে।"

"আঁ্যাঃ—" বলিয়া সাইমন একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার

পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"সেকি? মানুষের অসাধ্য কায আছে? সে যদি মনে করে যে আমি অমুক কায কর্‌ব,—তা হ'লে তাকে ঠেকায় কে?"

"বেশ, তবে আমিও কর্‌ব। সবাই যখন করে, তখন আমিই বা না পার্‌ব কেন?"

"বেশ। খুব ভাল কথা।—আচ্ছা তোমার নামটি কি?"

"মিচেল।"

"আচ্ছা মিচেল, তুমি তোমার পরিচয় তো কিছুই আমায় দিলে না? তা যদি কোন আপত্তি থাকে, দিও না। কিন্তু তুমি আমার কথা যদি বরাবর শোন, তাহলে তোমায় সমস্ত ভার আমি নিই।"

"নিশ্চয় শুন্‌ব। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন্। আমায় কি কায কর্‌তে হবে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও—আমি তাই কর্‌ব।"

সাইমন খানিকটা সেলাইকরা সূতা আনিয়া মিচেলকে দিয়া, বুঝাইয়া দিল কেমন করিয়া সূতা পাক দিয়া কাঠিমে জড়াইতে হয়। তারপর কি করিয়া জুতার মাপ লইতে হয়, কেমন করিয়া চামড়া কাটিতে হয়, কি ভাবে ফর্ম্মা চড়াইতে হয়, সোল নির্ম্মাণের কারিগরী কোথায়, কি করিয়া তালি লাগাইতে হয়—ইত্যাদি বিষয়ে সাইমন্ মিচেলকে তালিম দিতে লাগিল।

দুইদিন পরেই সাইমন্ দেখিল যে, মিচেলকে কোন কায একবার বুঝাইয়া দিলে দ্বিতীয় বার আর সে কায দেখিতে পর্য্যন্ত হয় না। তা ছাড়া, এত শীঘ্র এবং সহজে সে কায করিতে লাগিল, যেন চিরজীবন

সে কেবল এই মুচির কাষই করিয়া আসিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত কখনও সে কামাই করিত না। খাইতও খুব কম—ইহাতে সাইমন তাহার উপর বেশ সন্তুষ্টই হইল। যখন সে কোনও কায করিত না, তখন ঘরের কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কথা এত কম বলিত যে তাহাকে বাড়ীর সকলে এক রকম বোবাই ঠাওরাইয়াছিল। ঘরের বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া অথবা বিনা কাযে এখানে ওখানে ঘোরার বালাইও তাহার ছিল না। কায হাতে না থাকিলে সে গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া উপর পানে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাকে হাসিতে পর্য্যন্ত কখনও দেখা যায় নাই; কেবল প্রথম দিন যখন মাত্রিনা তাহাদিগকে খাওয়াইতেছিল, সেই সময় কেবল সে একবার ঈষৎ একটু হাসিয়াছিল মাত্র। তারপর তাহার মুখে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ কখনও হাসি দেখে নাই।

এক বৎসর চলিয়া গেল। মিচেল সাইমনের কায করিয়া দেয়, তাহার সঙ্গে থাকে। ক্রমে দেখা গেল, এই অল্পদিনের মধ্যেই সাইমন্ একজন নামজাদা মুচি হইয়া উঠিল। তাহার তৈরি জুতা দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি টেঁকসইও। সাইমনের যশ গ্রামের চারিদিকে প্রায় দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। বেশ দু'পয়সা উপায় হইতে লাগিল।

শীতকাল। সাইমন্ ও মিচেল উভয়েই কাযে খুব ব্যস্ত। এমন সময় দর্ দর্ করিয়া চক্‌চকে একখানি জুড়ী আসিয়া সাইমনের দোকানের নীচে দাঁড়াইল। গাড়ী থামিবামাত্র সহিস ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া দিল।

শাপমুক্তি

বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত একজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিলেন। বিনা বাক্যে পৈঠা তিনটি পার হইয়া তিনি একেবারে সাইমনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাত্রিনা সসম্ভ্রমে দুয়ার দুইপাট ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক মাথাটি নত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোজা হইয়া যখন তিনি দাঁড়াইলেন, মনে হইল যেন তাঁহার মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করিতেছে। সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি তাঁহার বিশালায়তন দেহখানিতে যেন একবারে ভরিয়া গেল।

সাইমন্ থতমত খাইয়া আভূমিনত হইয়া অভিবাদন করিল। এ রকম লোক সে ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সাইমন্ নিজে ছিল খুব বেঁটে এবং হৃষ্টপুষ্ট। মিচেল, সে বড় ক্ষীণ ও কৃশ। মাত্রিনা তো যেন এক আঁটি শুকনো কাঠ। সাধারণ মনুষ্য হইতে এই আগন্তুকটির দেহায়তনে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা সঠিক না জানিলেও, দর্শনমাত্রেই লোকের মনে একটা অকারণ সম্ভ্রমের উদ্রেক করিয়া দেয়!

লোকটি খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। সম্মুখস্থিত বেঞ্চের উপর কোটটি খুলিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোদের দু'জনের মধ্যে কারিগর কে রে?"

সাইমন্ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজ্ঞে হুজুর আমি।"

আগন্তুক তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—"ফেড্‌কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

ভৃত্য একটি পুলিন্দা আনিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিল।

"খুলে ফেল্ দিকিন্।"

"এই যে চামড়াটা দেখচিস"—বলিয়া ভদ্রলোকটি সাইমন্‌কে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

"আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্ এ কেমন চামড়া ?"

সাইমন্ খুব মনোযোগ দিয়া চাম্‌ড়াটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—"এ খুব সেরা চাম্‌ড়া, হুজুর। খুব ভাল চাম্‌ড়া।"

"কেমন, খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে তো ?...সত্যি সত্যিই এ খুব ভাল চাম্‌ড়া। এমন চাম্‌ড়া হয়ত তুই জীবনে কখনো দেখিসই নি! এই টুকুর দাম পনের টাকা।"

সাইমন্ বিস্মিত হইয়া আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"আমরা এমন মাল কোথায় আর দেখবো, হুজুর! আমরা গরীব—"

"হাঁ, তা' ঠিক, ঠিক। এখন এই চামডাতে আমার একজোড়া বুট জুতো কর্‌তে হবে, পার্‌বি ?"

"কেন পার্‌ব না হুজুর ? নিশ্চয় পার্‌বো।"

"নিশ্চয় পার্‌বি ? তা বেশ! কিন্তু মনে থাকে যেন কি চাম্‌ড়ায়, কার জুতোর ফরমাস।...জুতো আমার পূরো একটি বছর যাওয়া চাই। এক বছরের মধ্যে যেন এতে কিছু কর্‌তে না হয়। বুঝলি ? পূরো এক বছর যাওয়া চাই। যদি বুঝিস যে পার্‌বি, তবে নে চামড়া কাট—নৈলে আমায় সাফ্ জবাব দে যে, পার্‌ব না।... আমি এখন থেকেই বলে রাখ্‌চি যে, এক বছরের মধ্যে আমার জুতোর যদি কিছু খারাপ

হয়, তা'হলে তোকে জেলে দেব। আর যদি বেশ টেঁকে, বছর বাদে আমি তোকে এর জন্য দশ টাকা মজুরি দেব।"

এই লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া সাইমন্ একটু দমিয়া গেল! কি যে উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। মিচেলের পানে একবার তাকাইল, তাহাকে কনুই'য়ের এক খোঁচা দিয়া, এ ফরমাস লইবে কিনা ইশারায় জিজ্ঞাসা করিল।

মিচেল ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

সাইমন্ আগন্তুককে জানাইল যে সে এ প্রস্তাবে রাজি। এক বৎসরে তাহার তৈরি জুতার কিছুই হইবে না। দেখিতেও ঠিক নূতনের মতই থাকিবে।

অভ্যাগত তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া, পা উঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—"বেশ কথা! তবে এখন মাপ নাও!"

এত বড় পা সাইমন্ ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই। দুইখানি কাগজে পায়ের ভিতর ও বাহির ছকিয়া লইয়া সাইমন্ মাপ শেষ করিল। এই সময়টা আগন্তুক মিচেলের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সাইমনকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ঐ যে কায করচে—ও কে?"

"ও আমার কর্ম্মচারি, হুজুর। আপনার জুতো ঐ-ই বানাবে।"

গ্রাহক মহাশয় মিচেলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মনে রেখ এক বছরের মধ্যে আমার জুতোয় যেন হাত না লাগাতে হয়।"

সাইমন্ দেখিল যে মিচেল আগন্তুকের মুখপানে না চাহিয়া, তাঁহার মাথার উপর একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সেখানে বিশেষ দেখিবার মত সে যেন কিছু পাইয়াছে! কিছুক্ষণ ঐরূপে তাকাইয়া থাকিয়া

মিচেল এই অপরিচিতের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে, হঠাৎ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

খরিদ্দার মহাশয় মুচির কর্ম্মচারীর হাসিতে বিষম চটিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"হাসচিস কি দেখে রে, উল্লুক? হাসি কিসের? যে কায নিলি, সে কায কি করে তামিল করবি—তাই আগে ঠাওরা।"

মিচেল বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর করিল—"যে সময়ে দেওয়ার কথা ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই আপনার জুতো পেলেই ত হল মশায়? তা পাবেন।"

আগন্তুক ওভারকোটটি গায়ে দিতে দিতে বলিলেন—"হাঁ, তাই যেন মনে থাকে।"

তিনি উঠিলেন। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এবার মাথাটি নোয়াইতে ভুলিয়া গেলেন। ফলে চৌকাঠে কপালে এক বিষম ধাক্কা লাগিয়া গেল। আহত স্থানটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহস্বামীকে গালি দিতে দিতে তিনি বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

যেমন তিনি চলিয়া গেলেন, সাইমন্ অমনি কহিল—"বাপ্, মানুষ বটে! খুব শক্ত লোক, যা'হোক। এখনি আমার চৌকাঠখানাই ভেঙ্গে গেছিল আর কি? ওর কপালের আর এতে কি হবে?"

মাত্রিনা কহিল—"লোকটা যেন কেমন ধরণের! সুবিধের নয়।... যেন লোহায় তৈরি...মরণও যেন ওর কাছে আসতে ভয় করে।"

"তার পর, হাঁ ভাই মিচেল, ফরমাস্ তো নেওয়া গেল; কোনও বিপদে টিপদে পড়্‌বো না তো? এই নাও চাম্‌ড়াটা—আর এই নাও

পায়ের মাপ। ভাল করে বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে কেটো ছেঁটো ভাই, চাম্‌ড়াটা খুব দামী—আর ও লোকটাও তেমন ভাল বোধ হ'ল না! এ কাযটা একটু সাবধান হয়ে কোরো। তা, তোমার নজরও ভাল, বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে, কায কর্ম্ম তো বেশ ভালই শিখেচ—তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব? এটা এখুনি আরম্ভ করে ফেল তুমি। আমি আমার হাতের কাযগুলো সেরে নিই।”

মিচেল কায করিতে বসিয়া গেল। চাম্‌ড়াটা খুলিয়া সে কাটিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাত্রিনা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে কাটা ছাঁটা সেলায়ের কায দেখিয়া দেখিয়া সে প্রায় সমস্তই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভাবে বুটজুতার চাম্‌ড়া কাটিতে হয়, সে রকম না করিয়া, অন্য রকম করিয়া মিচেলকে চাম্‌ড়াটি কাটিতে দেখিয়া মাত্রিনা অবাক্ হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ মিচেলকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া লইল। ভাবিল—“হয়ত আমিই ভুল বুঝেচি! লোকটা বোধ হয় মামুলি বুটের ফর্‌মাস দেয় নি! অন্য কোন রকমের কাট বলে দিয়ে থাক্‌বে!...মিচেল আমার চেয়ে ভালই বোঝে! কাজ কি আমার এতে কোন কথা বলে?”

মাত্রিনা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মিচেল সেই চাম্‌ড়া হইতে একজোড়া ‘বাধা’, (Sandal) তৈরি করিয়া ফেলিল!

খাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া সাইমন্ দেখিল যে মিচেল বুট না করিয়া একজোড়া ‘বাধা’ তৈরী করিয়া বসিয়া আছে! সাইমনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুঃখে ও ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল।

..."অঁ্যা, শেষে মিচেল—যে কখনো এতটুকু চুক্ করেনি—তার এই কায ?" আর সাইমন্ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না! কহিল—"এ কী কর্‌লে, মিচেল ? এখন আমি সে ভদ্রলোককে কি বলে' জবাব দিই ? চাম্ড়াটাও তো গেছে একেবারে দেখ্ছি! এখন উপায় ? এ চামড়া তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না!...এখন কি করি ?...আজ তোমার হয়েছে কী ? ছি ছি ছি ছি! এইবার আমায় তুমি মজালে, দেখচি!...তিনি বুট জুতোর ফর্‌মাস দিয়ে গেলেন, তুমি 'বাধা' তৈরি কর্‌লে কোন্ খেয়ালে ?..."

দুয়ারে ঘন ঘন করাঘাত শ্রুত হইল। জানালার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিল একজন পাইক, তাহাদের দুয়ারের কড়ায় ঘোড়া বাঁধিতেছে।

সাইমন্ তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিতে গেল। পাইক হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"আদাব মিস্ত্রি ভাই!"

"আদাব। কি চাই ?"

"আমাদের গিন্নি-মা আমায় সেই বুটের জন্য পাঠালেন!"

"বুট ? কোন্ বুট ?"

"কর্ত্তার সে বুটের আর দরকার নেই! বুট পরা' তাঁর হয়ে গেছে!"

"কার ? কি ?...আমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পার্‌চিনে! কি বল্‌চ স্পষ্ট করে' বল।"

"কর্ত্তা পথে গাড়ীতেই মারা গেছেন। বাড়ী পৌঁছে গাড়ীর দরজা খুলে যখন আমি দাঁড়ালাম, দেখি যে তখন তিনি গাড়ীর ভিতর মরে' কাঠ হয়ে বসে আছেন! তখন সবাই মিলে তাঁকে আমরা ধরাধরি করে নামালাম।

তাই গিন্নি-মা বলে' পাঠালেন মুচিকে গিয়ে বলগে যে বুট আর কর্‌বার দরকার নাই, সেই চামড়ায় একজোড়া কবরের জন্যে 'বাধা' তৈরি কর্‌তে হবে। তুমি সেখানে বসে থেকে যত শীগ্‌গির পার 'বাধা'-জোড়াটি করিয়ে নিয়ে তবে আস্‌বে। আনা চাই-ই।"

মিচেল সদ্যপ্রস্তুত 'বাধা' জোড়াটি ও উদ্বৃত্ত চামড়াটুকু একটি কাগজে মুড়িয়া ছোট খাট একটি পুলিন্দা বাঁধিয়া আনিয়া পাইকের হাতে দিল। পাইক পাইবামাত্রই 'আদাব, ভাই, আদাব আদাব"—বলিয়া তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মিচেল আজ ছয় বৎসর হইল সাইমনের পরিবারভুক্ত হইয়াছে! আজ পর্য্যন্ত মিচেল কখনও ঘরের বাহিরে যায় না। কথা খুব কম বলে। যেমন দিন যাইতেছিল তেমনিই দিন কাটিতেছে। কেবল দুইবার মাত্র সাইমন মিচেলকে সামান্য একটু হাসিতে দেখিয়াছে। প্রথম সেই যে দিন মাত্রিনা তাহাকে পরিবেশন করিতেছিল, আর সেই দিন যখন ভদ্রলোকটি বুটজুতার ফর্‌মাস দিতে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ মিচেলের উপর সাইমনের স্নেহ ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। আজ আর সাইমন্ এ অপরিচিতের পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল নয়। এখন তাহার সদাই আশঙ্কা, কবে এ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

সকলে মিলিয়া একদিন সেই কুটীরে বসিয়া নিজের নিজের কায করিতেছে। ছেলেগুলি জানালার উপর চড়িয়া নামিয়া লাফালাফি করিয়া খেলা করিতেছে। মাত্রিনা ছেলেদের ময়লা কাপড়গুলি কাচিতেছে, সাইমন্ একটা জুতায় সোল ঠুকিতেছে, আর মিচেল জানালার সম্মুখে

বসিয়া প্রস্তুত-প্রায় এক জোড়া জুতার গৌড়ালিতে মোম ঘষিতেছে। সাইমনের এক পুত্র মিচেলের কাঁধে হেলিয়া কহিল—"দেখ দেখ মিচেল কাকা, কেমন ছোট দু'টি মেয়ে আস্ছে। আহা, একটী বুঝি খোঁড়া, নয় মিচেল কাকা? এইদিকেই তো আস্চে? এখানেই আস্বে বুঝি?"

মিচেল হাতের কায ন'মাইয়া রাখিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। সাইমন্ মিচেলের এই ভাবান্তরে আজ একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এতদিন যে মিচেল এখানে আছে, কখনও যে ভুলিয়াও পথের পানে চায় নাই—আজ তাহার এ কী? সে যে একদৃষ্টে তাকাইয়াই রহিয়াছে। সাইমনও ব্যাপার কি জানিবার জন্য পথের দিকে চাহিল। দেখিল একজন সুবেশা মহিলা ছোট ছোট দুইটি মেয়ের হাত ধরিয়া তাহারই বাড়ীর পানে আসিতেছেন। মেয়ে দু'টির প্রত্যেকেরই গায়ে একটি করিয়া গরম জ্যাকেট ও তাহার উপর একটি শালের ওড়্না। মেয়ে দুটি খুবই ছোট; কিন্তু দুটির চেহারায় এত মিল, যে একটি যদি খোঁড়া না হইত, তবে কোন্‌টি কে চিনিতে মহা মুস্কিল বাধিত।

মহিলাটি মেয়ে দুটিকে আগে করিয়া আস্তে আস্তে দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কৈ গো মিস্ত্রী কোথায়—"

"আসুন্, আসুন্, আস্তে আজ্ঞা হোক্। বসুন্, বসুন্। হুকুম?"

মহিলাটি বেঞ্চের উপর বসিলেন। মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে তাঁহার হাঁটু দুটিতে ঠেস্ দিয়া কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি এই মেয়ে দুটির জন্যে দু'জোড়া জুতো চাই।"

"তা বেশ। তা বেশ। তবে এত-ছোট জুতো আমরা এর আগে কখনো করিনি। সেই জন্যে...মোটের উপর চেষ্টা করে দেখতে পারি। ...হাঁ, এর ভিতরটায় কি শুধু চামড়াই থাকবে, না একটা কাপড় বসিয়ে দেব? আপনার যা পছন্দ, বলুন। এই যে মিচেল, আমার কর্ম্মচারী—এ খুব ভাল কারিগর।"

সাইমন্ পিছন ফিরিয়া দেখিল যে, মিচেল সেই মেয়ে দু'টির পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। ইহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মেয়ে দু'টি বাস্তবিক বেশ সুন্দরী। বয়স প্রায় ছয় সাত বৎসর।—কেমন টল্‌টলে গোলাপ ফুলের মত গাল দুটি—কেমন কালো চোখ দুটি,—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা—যেন দুখানি ছবি! কিন্তু মিচেল এদের পানে এমন করিয়া চাহিয়া কেন?—ওর মৎলবটা কি?—মিচেলের চাহনি ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাইমন্ ভাবিল, বুঝি এরা এর পরিচিত।

রমণী সেই খোঁড়া মেয়েটিকে হাঁটুর উপর তুলিলেন। মিচেল তাহাদের মাপ লইল। রমণী বলিলেন—"মাপ দুটো নিলেই হবে। তিনপাটী জুতো তো একই মাপের, আর একপাটী কেবল এর খোঁড়া পায়ের।—এরা দু'টী যমজ কিনা, পা দু'টীর মাপও তাই একই।"

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ মেয়েটী খোঁড়া কি করে হল মা ঠাকরুণ? জন্ম থেকেই কি এম্‌নি?"

"না, ওটা ওর মার দোষে হয়েচে।"

মাত্রিনার কৌতূহল আর বাধা মানিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে এ দুটী কি আপনার মেয়ে নয়? আমি ভেবেছিলাম আপনিই এঁদের মা।"

"না মুচিবৌ, আমি এদের মা তো নই-ই, কোনও সম্বন্ধ পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে আমার নেই। এরা আমার পুষ্যি মেয়ে।"

"সে কি? আপনি এদের কেউ নন্ অথচ মানুষ করছেন?"

"না করে কি করি মা? আমি এ-দিকে মানুষ করবারই ভার নিয়েচি যে! আমারও একটী ছেলে ছিল; ভগবান্ তাকে কেড়ে নিলেন। কিন্তু তাকেও কখনো আমি এদের চেয়ে বেশী ভালবাসিনি।"

"এরা তবে কার সন্তান?"—বলিয়া মাত্রিনা সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মহিলা যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপত এই :—

"আজ ছ' বছর হলো এরা বাপ মা হারিয়েচে। এক মঙ্গলবারে এদের বাপ মারা গেল, ফিরে শুক্রবারে মায়েরও পরমায়ু শেষ হল। এরা ভূমিষ্ঠ হবার পর এদের মা কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। আমি আর আমার স্বামী ছিলাম এদের প্রতিবেশী। এদের বাপ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মাথায় গাছ পড়ে মারা যায়—এত সাংঘাতিক রকমে আঘাত লেগেছিল যে বাড়ী নিয়ে আসার পর খুব অল্পক্ষণই বেঁচে ছিল। এই দুর্ঘটনার দু'দিন পরেই এদের জন্ম হয়। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না, কেই বা দেখে, কেই বা শোনে, কেই বা প্রসূতির সেবা-শুশ্রূষা করে! তাতে আবার প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রসূতিও মারা পড়ল। আমি খোঁজ নিতে গেলাম। গিয়ে দেখি যে এই মেয়েটীও মরার মত হয়ে পড়ে আছে। বৌটী এর একটা পা চেপে মরে পড়ে আছে। কাযেই তখন একটা মহা সমস্যা উঠলো, কি করে এই নিরাশ্রয় শিশু দু'টীকে বাঁচান যায়? কে এদের ভার নেয়? গাঁয়ে সে সময় একমাত্র ছেলে-

কোলে আমিই ছিলাম। আট মাস আগে আমার খোকা হয়েছিল। ঠিক হলো যে আমাকেই এ দুটীর ভার নিতে হবে!

"বাড়ী নিয়ে এলাম; এ খোঁড়া মেয়েটি যে বাঁচবে এ ভরসা আমার ছিল না বলে আমি এর দিকে বড় একটা চাইতাম না। এক পাশে ফেলে রেখে দিতাম। কিন্তু শেষে ওর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল! আমি তিনটি শিশুরই মা হলাম—আমার খোকাও বেঁচে ছিল কি না। আর সে সময় আমার বয়সও কম ছিল, শরীরে সামর্থ্যও ছিল, আর ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—তিনটি শিশুকেই আমি মানুষ করে তুলতে লাগলাম। কিন্তু দু'বছর বয়সে ভগবান আমার খোকাকে কেড়ে নিলেন—আর আমার ছেলেপিলেও হল না। কাযেই এদিকে আমি পেটে না ধরলেও—তেমনিই ভালবাসি। এরাই এখন আমার চোখের আলো, বুক-জুড়োনো মাণিক।"

রমণী উঠিলেন। সাইমন ও মাত্রিনা উভয়েই তাঁহাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মিচেলের কাছে গিয়া বসিল। মিচেল তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হাত দুটী যোড় করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে ঢুলু ঢুলু নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার অধরপ্রান্তে খানিকটা স্নিগ্ধ হাসি জমাট হইয়া লাগিয়াছিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই মিচেল, তুমি অমন করে বসে' আছ যে?"

মিচেল হাতের যন্ত্রপাতি নামাইয়া গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাইমন ও মাত্রিনাকে ভক্তিভরে

প্রণাম করিয়া কহিল—“ভগবান্ আমায় ক্ষমা করেছেন, তুমিও আমায় ক্ষমা কর, বন্ধু।”

মিচেলের দেহ হইতে যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

সাইমন তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সসম্ভ্রমে মাথা নত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—“মিচেল, তুমি তো ভাই আমাদের মত মানুষ নও দেখ্‌চি।—তোমার পানে আর চাইতে পার্‌চিনে, কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হচ্ছে না—যে দিন আমি তোমায় প্রথম দেখি আর বাড়ী নিয়ে আসি, সে দিন তোমায় বিমনা ও বিমর্ষ কেন দেখেছিলাম; ভাই? তারপর, যখন আমার স্ত্রী তোমায় খেতে দিলেন, তখন তোমায় যেন অনেকটা প্রসন্ন বলে বোধ হয়েছিল। তুমি সেদিন একটু হেসেও ছিল। তার পর কতদিন পরে, যখন সেই ভদ্রলোকটি জুতোর ফর্‌মাস্ দিতে এসেছিলেন—সে দিনও তোমায় বেশ একটু খুসী খুসী দেখেছিলাম। আর আজ এই স্ত্রীলোকটি যখন মেয়ে দু'টিকে নিয়ে এল—তখন আনন্দে তোমার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছিল্।—একি! তোমার গা হতে এ সমস্ত আলো বেরুচ্চে কেন ভাই?—আর এই এত দিনের মধ্যে তোমার মুখে কেবল তিন দিনই বা কেন হাসি দেখলাম?”

মিচেল উত্তর করিল—“আমার আনন্দ আজ আর ধর্‌ছে না—আমার সুখের আর সীমা নেই! ভগবান আমায় ক্ষমা করেছেন্। তিনটি জিনিষ শিক্ষা কর্‌বার জন্যে ভগবান আমায় আদেশ করেন। আজ সে আজ্ঞা পালন শেষ হল,—সে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা আজ আমার সমাপ্ত

হল। সে জন্যে আমি কেবল তিনটিবার মাত্রই হেসেছি। আজ আমার শিক্ষার শেষ।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সাইমন বলিল—"মিচেল, তুমি কী বলচ'? ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করেচেন? তবে কি তিনি তোমায় সাজা দিয়েছিলেন? কেন সাজা দিয়েছিলেন ভাই? আর, সে আদেশ তিনটিই বা কি? দয়া করে আমাদিগকে বল'—আমরাও তা' শিখি।"

মিচেল বলিল—"হাঁ, ভগবান্ আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন কারণ আমি তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে, তাঁর আদেশ অমান্য করেছিলাম। আমি একজন স্বর্গদূত ছিলাম। ভগবান্ একদিন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে আমায় বলেন। পৃথিবীতে নেমে এলাম। এসে দেখি রমণীটি খুবই পীড়িত। তার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সে আবার দুটি যমজ কন্যাও প্রসব করেছিল। সদ্যঃপ্রসূত সেই শিশু দু'টি তার কোলের কাছে পড়ে' পড়ে' কাঁদচে, অথচ তার এমন শক্তি নেই যে বুকে তুলে নিয়ে স্তন দেয়। আমায় দেখেই সে স্ত্রীলোকটির আর বুঝতে বাকী রইল না যে আমি কে, বা কেন এসেচি। আমায় করুণ স্বরে সকাতরে সে বল্লে—'দূত, ওগো ঈশ্বরের দূত,—তিন দিন হল, গাছ চাপা পড়ে আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার আর ভাই ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন—আপনার বল্‌তে একজনও পৃথিবীতে নেই।—পিতৃহীন এই দু'টি মেয়ের আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।—আমায় রক্ষা কর' এখন আমার আত্মা হরণ কোরো'না। আগে এ দুটি মানুষ হোক্—আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে শিখুক্—তারপর তুমি এসো, স্বর্গদূত।—না বাপ না মা, এই কচি ছেলে নইলে কি করে বাচবে?'

"রমণীর কথায় আমার বুক ফেটে গেল! ভগবানের আদেশও ভুলে গেলাম। রোরুদ্যমানা শিশু দুটির একটিকে তার বুকে, অপরটিকে তার বাহুর উপর তুলে দিয়ে, আমি শুধু হাতে স্বর্গে ফিরে গেলাম।—ভগবৎ চরণে নিবেদন করলাম—'প্রভু সে স্ত্রীলোকটির আত্মা আনতে আমি পারলাম না। তিন দিন হল তার স্বামী মারা গেছে—আপাততঃ তার দুটি যমজ কন্যা হয়েছে—তার উপরে নিজেও সে খুব রুগ্ন। সে বড় বিব্রত। তাই সে এই শিশু দুটিকে মানুষ করবার জন্যে আমার কাছে তার জীবন ভিক্ষা করল।'

ঈশ্বর বজ্রগম্ভীর স্বরে আবার সেই আদেশ দিলেন—ফিরে যাও, এক্ষণি আবার ফিরে যাও—সেই স্ত্রীলোকটির আত্মা নিয়ে এসে অবিলম্বে হাজির কর। এখনও তুমি বুঝতে পারনি আমার আদেশ কী?—তুমি জাননা, **মানুষের মধ্যে কি আছে; মানুষকে কি দেওয়া হয়নি; এবং মানুষ কি করে বাঁচে**—এই তিনটি বাক্যের অর্থ তোমার শেখা প্রয়োজন। যতদিন না এ তিনটি বিষয় শিখচো, তত-দিন তোমার কাছে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকবে। যাও, নিয়ে এসো। আর যতদিন না তোমার শিক্ষা শেষ হয় ততদিন স্বর্গদ্বার তোমার কাছে রুদ্ধ। আজ হতে তুমি পতিত।"

আবার আমি পৃথিবীতে নেমে এলাম। এবার আর কোনও কথা শুনলাম না—সে রমণীর আত্মা বহন করে নিয়ে গেলাম। তার বুক ও বাহু হতে সর্ সর্ করে শিশু দুটি মাটিতে পড়ে গেল। যাবার সময় স্ত্রীলোকটি বাঁ'দিকে যেমন একটু ফিরলো, অমনি একটি মেয়ের কি করে পা চাপা পড়ে' গিয়েছিল।—আমার বোঝা নিয়ে আমি আকাশ পথে

উঠেচি, তখনও গাঁয়ের সীমা পার হইনি, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় আমার পাখাছুটি খসে গেল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। রমণীর আত্মা একাই স্বর্গপুরীতে চলে গেল। মাটিতে পড়ে আমি রাস্তার ধারে বসে রইলাম।"

সাইমন্ ও মাত্রিনা এতক্ষণ একাগ্র বিস্ময়ে চুপ করিয়া শুনিতেছিল; এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে এতদিন ইহারা কাহাকে খাওয়াইয়াছে পরাইয়াছে।—পুলকে বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে তাহাদের চক্ষু ভরিয়া আসিল।

স্বর্গদূত বলিতে লাগিলেন—"রাস্তার ধারে সেই আমি একা উলঙ্গাবস্থায় বসে রইলাম।—কি করি, নিরুপায়! মানুষের আচার ব্যবহারও তো কিছুই জানতাম না। ক্ষিদে ও শীতও আমার কাছে সেই প্রথম। কারণ আমি তখন মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। কাজেই পেটের জ্বালায় ও শীতেই আমি সবচেয়ে বেশী কাতর হয়ে পড়্‌লাম। নিকটে একটা গির্জ্জা ঘর দেখে মনে একটু ভরসা হল যে এ ঘরটি ঈশ্বরের নামে তো পবিত্র, এখানে গেলে একটু আশ্রয় পাবই—ঠাণ্ডা হ'তে বাঁচ্‌ব। ও হরি, সে বাড়ীর দোরেও তালা বন্ধ। ঢুক্‌তে পেলাম না। কাজেই কোণ ঘেঁসে বসে কোনও রকমে শীত নিবারণ কর্‌তে লাগ্‌লাম। এমন সময় হঠাৎ মানুষের পদশব্দ পেলাম—দেখলাম একজন মানুষ এক জোড়া বুট জুতো হাতে করে দোলাতে দোলাতে সেই দিকে আস্‌চে। আমি মানুষ হ'য়ে সেই প্রথম মানুষের মুখপানে চেয়ে দেখলাম। সে তুমি, সাইমন। মনে আমার কেমন একটা ভয় হল! তুমি বিড়্ বিড়্ করে' কি বক্‌ছিলে, সে ভাষা আমার বোধশক্তির সম্পূর্ণ অতীত না হলেও আমি

শুনতে পেলাম তুমি বলচ—'কি করে আমি আমার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াই ? এই দুরন্ত শীত থেকে পরিত্রাণ পাবার মত গরম কাপড়ই বা কোথায় পাই ?

"তুমি আমায় দেখ্‌তে পেলে। আমাকে দেখেই, কপাল কুচ্‌কে, মুখখানা বিষ করে, চলে গেলে। আমি হতাশ হ'য়ে পড়লাম। খানিক পরেই দেখি, তুমি আবার ফিরে এলে। আমি তোমার মুখপানে চাইলাম. দেখ্‌লাম যদিও মৃত্যুর ছাপ পরিস্ফুট, তবুও তাতে প্রাণের আলো কম নেই। আর সেই আলোতে ভগবানের মহিমা প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে আরো শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। তুমি আমার কাছে এলে, আমায় নিজের কাপড় খুলে দিয়ে আবৃত করলে, তারপর আস্তে আস্তে হাতটি ধরে' তোমার নিজের বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিলে। তোমার স্ত্রী দো'র খুলে দিতে এল। আমাদের সঙ্গে কথাও কইলে ; তবু পুরুষ মানুষকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন তাকেও এত ভয়ানক মনে হয় নি।

"ক্ষিদের হিমে এবং দুর্বলতায় আমি দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পারছিলাম না, তা সত্ত্বেও মাত্রেনা, তুমি আমায় গৃহে একটু স্থান দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলে।—সেই শীতের রাতে ক্ষুধিত ও হিমার্ত্ত অতিথিকে আবার নিরুদ্দিষ্ট পথে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, মনে আছে ? বুঝ্‌লাম, আমায় তাড়িয়ে নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে আনচ। এমন সময়ে তোমার স্বামী যখন তোমাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তুমি ঠাণ্ডা হলে। অকস্মাৎ তোমার সব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তুমি আমায় খেতে দিয়ে যখন অপেক্ষা করছিলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়। দেখ্‌লাম—তুমি আর সে-নারী নও। তোমার মুখে তখন ভগবানের মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। অমনি আমার ভগবৎ-বাক্য

মনে পড়্‌ল—'মানুষের মধ্যে কি আছে!' আমি আগে জান্‌তাম না, সে দিন জান্‌লাম—**মানুষের মধ্যে আছে প্রেম, দয়া আর স্নেহ।**

"অধঃপাতের প্রথমদিনেই একটা সমস্যার উত্তর হলো, একটা বিদ্যা শিখে ফেল্‌লাম—তাই মনের আনন্দে সেই দিন একটু হেসে ফেলেছিলাম

"আমার সব শিক্ষা ত' একদিনে হবার নয়। তখনও দুটি কথা আমার শিখ্‌তে বাকী—মানুষকে কি দেওয়া হয়নি এবং মানুষ কি-করে' বাঁচে!

"তারপর একদিন দেখি যে এক ধনী বিষয়-মদে মত্ত, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—একজোড়া জুতার ফরমাস্ দিতে এলেন। সে চায় তার বুট জোড়াটি এক বছরের মধ্যে যেন আর সারাতে না হয়—এম্‌নি মজবুত একজোড়া বুট। আমি তো তার খুব কাছেই ছিলাম—তবুও আমি তার মুখ দেখ্‌তে পেলাম না। দেখলাম তার মাথার উপরে আমার একজন স্বর্গসাথী মৃত্যুদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পারনি, পাওয়া সম্ভবও নয়। তখনি বুঝ্‌লাম যে আজকের সূর্য্যের ও যেটুকু পরমায়ু, এ ব্যক্তির তাও নেই। ভেবে হাসি পেল যে, যার আর কয়েক ঘণ্টামাত্র জীবন, সে-ও এখনো এক বছরের জন্যে সব আয়োজন করচে। সে নিজেও জানে না যে এখনি তার সব ফুরিয়ে যাবে, সব ফেলে যেতে হবে।

"ভগবানের দ্বিতীয় আজ্ঞাও বুঝ্‌তে পারলাম—'মানুষকে কি, দেওয়া হয় নাই।' **মানুষকে কেবল ভবিষ্যৎটা জান্‌তে দেওয়া হয়নি।** তাকে আশা ও মায়া দিয়ে ভুলিয়ে খুব খুসী

করেই রাখা হয়েছে। কাযেই সেদিন দ্বিতীয়বার একবার হেসে ফেলেছিলাম।

"তবুও আমার শিক্ষা শেষ হল না। তৃতীয় অনুজ্ঞা—'মানুষ কি করে বাঁচে'—আমার তখনও শেখা হয়নি। দিনের পর দিন চলে যায়—আমি পরমপিতার শেষ আজ্ঞা পালনের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

"ছয় বৎসর আমি স্বর্গভ্রষ্ট, আজ ঐ মহিলা, দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে এলেন। আমি মেয়ে দুটিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। পরে যখন শুনলাম যে আজও কি করে' তারা বেঁচে আছে—তখন আমার শেষ শিক্ষাও সমাপ্ত হল!

"যখন সেই প্রসূতি এই দুটি নিরাশ্রয় মেয়ের মুখ চেয়ে, আমার কাছে তার প্রাণ-ভিক্ষা করেছিল, আমি আমার স্বর্গচ্যুতি নিশ্চয় জেনেও মুমূর্ষু মাতার সে অনুরোধ রক্ষা করতে সাহসী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মা ছাড়া সে দুটির বাঁচা একেবারেই অসম্ভব! কিন্তু কৈ তাতো হল না। এই নারী, এদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা ও অনাত্মীয়া, আপনার বুকের রক্ত দিয়ে এদের বাঁচিয়ে তুলেছেন, আপনার শরীর মাটি করে' এদের শরীর গড়িয়ে দিয়েছেন। এই মহিলাটির মুখে করুণাময় ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে আমি আজ বুঝতে পারলাম—'মানুষ কি করে বাঁচে।' মরবার বা বাঁচাবার মালিক যে কে, তাও আমার এই সঙ্গে শেখা হয়ে গেল।

"কাযেই, আজ সম্পূর্ণ শিক্ষার অতুল আনন্দে আমি প্রাণ ভরে হেসেছি। আজ কি আমার কম সুখ, কম সৌভাগ্য? আজ ঈশ্বর আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন, আজ আমার শিক্ষা সমাপ্ত।"

শাপমুক্তি

বলিতে বলিতে স্বর্গদূত নর-ধরণীর জীর্ণ বাস খুলিয়া ফেলিয়া এক অসহ্য—তীব্র জ্যোতির্ম্ময় বসনে সজ্জিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ভাব-গদগদ ও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। বলিলেন—"বুঝেচি, **মানুষ বাঁচে প্রেমে**; বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করলে বাঁচা যায় না।"—আওয়াজ ক্রমশঃ মধুরতর হইয়া আসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন ঘরের ছাদ ফাটিয়া গেল। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব আলোকময় পথ নির্ম্মিত হইয়া গেল। স্বর্গদূত ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সেই পথে যাত্রা করিলেন। সাইমন সপরিবারে মেঝের মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কক্ষ মধ্যে তখনও স্বর্গদূতের সেই অমৃতময় কণ্ঠরব প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সাইমনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে দেখিল যে, ছাদ যেমন তেমনই অটুট আছে। সে তাহার ছেলে পিলে লইয়া আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে; কেবল মিচেল নাই।*

---

* কাউণ্ট টলষ্টয়ের একটি গল্পের অনুবাদ হইতে।

মৃত্যু-অভিসার

সে-বৎসর পূজার ছুটিতে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া, মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার অত্যন্ত সখ হইল। সেই সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকরূপে অবতীর্ণ হইবার প্রবল দুরাশাও যে আমার মনে হয় নাই তাহাও নয়। আপিসের পর বাড়ী আসিয়া জলযোগান্তে মোটা মোটা ইতিহাস-গ্রন্থ লইয়া বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতাম ; মানুশী, বার্ণিয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, যদু সরকার প্রভৃতির অনেক গ্রন্থই একে একে পাঠ করিয়া ফেলিলাম। আমার অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, বলিতে লাগিলেন—"শেষে কি বুড়ো বয়সে একটা মাথার ব্যারাম বাধিয়ে বসবে?—ও সব ছাড়'। যা রয় সয় তাই কর।" অবশেষে আমার পত্নীকে মধ্যস্থ করিয়া তাঁহারা বহিগুলি কাড়িয়া লইয়া তালাচাবির মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। আমার ইতিহাস-সেবারও ইতি হইল।

ঐতিহাসিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা এইরূপে মধ্যপথে শেষ হওয়াতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াই কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, এক রজনীতে একটি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলাম। এমন সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট স্বপ্ন জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

শাপমুক্তি

স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী-শিক্ষিত বাবু নহি —আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন লোক। শাহ আলম বাদশাহ যেন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আমি দেশভ্রমণ উদ্দেশে পশ্চিমের কোনও একটি সমৃদ্ধ নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, সেই সহরের প্রান্ত-ভাগে ভূতপূর্ব্ব নবাব হেদায়েৎ আলির ভগ্ন রাজপ্রাসাদ আছে তাহা এখানকার দর্শনীয়। বহুকালের এক বৃদ্ধা—তাহার নাম খথ-বুড়ী,-সেখানে বাস করে—আর তথায় জনপ্রাণী নাই। শুনিয়া, সেই ভগ্না-বশেষ দেখিবার কৌতূহলে আমি যেন নগরপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তথায় প্রকাণ্ড এক পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী। তাহার প্রাচীর ও দেও-য়ালের ফাটলে এত অসংখ্য বৃক্ষলতা গজাইয়া উঠিয়াছে যে প্রথম দর্শনে মনে হয়, যেন ছোট একটি স্তূপের উপর নিবিড় জঙ্গল। ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বহুবিস্তৃত অট্টালিকার অবশেষ। তাহার বালি চুণ কবে খসিয়া পড়িয়াছে, ইটগুলি শৈবালে আবৃত; বারান্দায় নামাল্-নামা মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ। জানালা কপাট কোনওটি ঝুলিতেছে, কোনটি পড়িয়া গিয়াছে —তাহার উপর উই-ঢিপি—তাহার উপর কোন্ এক জংলী গাছের শাদা-শাদা ফুলগুলি সেই ভয়ঙ্কর ভগ্নস্তূপ দেখিয়া যেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। ইহার মধ্যে একটা কবর এবং নিকটে বসিবার ছোট একটি স্থান। কবরের চারিধার ফুল দিয়া সাজান: আর তাহারই পার্শ্বে বসিয়া এক বৃদ্ধা রমণী।

বৃদ্ধার শরীর এত কৃশ যে তাহার পঞ্জরাস্থিগুলি পর্য্যন্ত গণনা করা যায়। দেহবর্ণ কালে যে খুব উজ্জ্বল ছিল, বর্ত্তমানের রক্তহীন পীত

আভাটুকুই তাহার প্রমাণ। চক্ষু দুইটি কোটরলীন, ভ্রূযুগল শুভ্র, ললাটে চিন্তাকালিমা—সমস্ত মুখের ভাবটি যেন অনুজ্জ্বল একটি দীপশিখার মত স্থির এবং ম্লান। বৃদ্ধার পরিচ্ছদ মুসলমানী ধরণের। জীর্ণ শততালিযুক্ত একটি পাইচেদার পায়জামা, গায়ে শেলুকা, মাথায় দোপাটা, পায়ে ছেঁড়া এক জোড়া পুরজার্ জুতী।

বৃদ্ধা আমায় সেখানে দেখিয়া প্রথমটা যেন চমকিয়া উঠিল। ক্রমে তাহার মুখে বিরক্তি, তাহার পর ঔদাসীন্য এবং শেষে লজ্জার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল।

অপরাহ্ন কাল। বৃদ্ধা সেই কবরের নিকটস্থ বেদীতে বসিয়া কি পড়িতেছিল। চারিপাশে মাছি ও মশার ভন্ ভন্ আওয়াজে স্থানটি আরও অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম—এই সেই যখ-বুড়ী। জিজ্ঞাসা করিলাম —"তুমি কে গা—এখানেই বা বসিয়া থাক কেন?"—নিজের পরিচয় দিতে বৃদ্ধা যতই অস্বীকার করিতে লাগিল, আমারও কৌতূহল এবং বিস্ময় ততই গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি নাছোড়বান্দা—অনেক কষ্টে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, অবশেষে বৃদ্ধাকে তাহার আত্মপরিচয় দিতে সম্মত করিলাম। সে বলিতে লাগিল—

এই যে প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ অট্টালিকা দেখিতেছ, বাবু—ইহাই ভূত-পূর্ব্ব নবাব হেদায়ৎ আলির প্রাসাদ। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা আমিনৎ-উন্নিসা খাতুন। যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ—এ স্থান ছিল বেগমমহলের অন্তঃপুরোদ্যান।

আজ এ বাড়ীতে সর্প বাদুড় ও অন্যান্য ঘৃণিত পশু পক্ষী ছাড়া আর

কেহই নাই। মানুষ কেহই এখানে আসে না। মানুষই বল, আর প্রেতই বল, থাকি মাত্র আমি। আজ ষাটবৎসর আমি এইভাবে এখানে বসতি করিতেছি। কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? কারণ, এই মাটীর মধ্যে আমার সর্ব্বস্ব পোঁতা আছে। আমি যখের মত কেবল সেই প্রোথিত গুপ্ত ধন রক্ষা করিতেছি।

যে-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে একদিন কত শত কর্ম্মচারীর উমেদারী করিতে হইত—আজ সেখানে মানুষ আসিতে চাহে না, ভয় পায়। দিবা দ্বিপ্রহরেও শৃগালেরা চীৎকার করিয়া অতীত দিনের নকীব-বৈতালিক-গণকে উপহাস করিতেছে; সর্পসরীসৃপাদি সেই ভূমিতে মৌরশীপাট্টা লইয়াছে। অপ্রতিহত নবাবীরও এই পরিণাম।

অধুনা-ভগ্ন এই বিরাট অট্টালিকায় যখন সুখসৌন্দর্য্যের অন্ত ছিল না, সেই সময় ষাটবৎসর পূর্ব্বে ইহারই একটি কক্ষে জগতের আলোক প্রথমে আমার নয়নে পতিত হয়। এই পুরীই আমার জীবনারম্ভের সূতিকাগৃহ, বাল্যের ক্রীড়ানিকেতন, যৌবনের স্বপ্নলোক, বার্দ্ধক্যের বিশ্রাম-বেদী এবং প্রতীক্ষিত পরলোকের সিংহদ্বার। আমার আজন্মের হাসি গান এই বাতাসে মিশিয়াছে, গোপন কথা মনের ব্যথা এই আকাশে লীন হইয়াছে, চোখের জল বুকের রক্তও এই মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। আমারই মত গতযৌবনা হৃতশ্রী এই পুরীর পঞ্জরাস্থিগুলি কালচক্রের কালিমায় আজ আমারই মত ভয়ঙ্কর,—তাই আমি জীবন থাকিতে এ পুরীর মায়া ভুলিতে পারিতেছি না, কখনো পারিবও না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবাব হেদায়ৎ আলির আমিই একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁহার স্নেহাদরের অজস্র অফুরন্ত কুবেরকোষের আমিই একমাত্র

অধিকারিণী ছিলাম। আমার নয়নপ্রান্তে অশ্রুলেখা দেখিলে পিতার মুখ অন্ধকার হইয়া যাইত, মাতার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইত।

ঈশ্বর সুপ্রসন্ন না হইলে কি নবাবের একমাত্র সন্তান হওয়া যায়? তাই আমার রূপও ছিল অসামান্য, বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। আমার শিক্ষক বৃদ্ধ মৌলভী তাঁহার মেহেদী-রঙীন দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশিতে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বিনয়াবনত মস্তকে প্রায়ই স্বীকার করিতেন যে, আমি ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দাসী বাঁদীগণও আমার ব্যবহার এবং স্বভাব-মাধুর্য্যের গুণগান করিয়া করিয়া অতি বাল্য বয়সেই আমার —দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল—যে আমি সকলের হইতে বিভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ; আমারই সব, কিন্তু আমি কাহারও নহি; আমি যাহা করিব তাহাতে বাধা দিবারও কেহ নাই।

দর্পণে যখন মুখ দেখিতে শিখিলাম, তখন আমার বয়স ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বর্ষ। সে যে কী দেখিতাম, আজ তোমায় আর তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব, পথিক? আমি আমার দেহ ও রূপ লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কবে ঠিক স্মরণ নাই, কি করিয়া হঠাৎ আমার মনে হইল—এ রূপযৌবন শুধু একেলা আমার সম্পত্তি নহে—ইহার কে যেন একজন অংশীদার আছে! এ অতুল সম্পদ যেন অজ্ঞাত আর একজনের জন্য। এ রূপকোষ সেইজনকে না দিতে পারিলে যেন নিতান্তই ব্যর্থ নিষ্ফল এবং নিরর্থক!

মনে অমনি নানাপ্রকারের প্রশ্ন, তারার মত আলোক বিকীর্ণ

করিয়া, ফুটিয়া উঠিল। কে সে? এ দেবভোগ্য আয়োজন-উপচার ভোগ করিবে, কে সে ভাগ্যবান?

যখন একাকিনী প্রাসাদশীর্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতাম, দিগন্তবিস্তৃত গগনসীমায় অস্তমান রবির কর-তুলিকা সম্পাতে সমস্ত পশ্চিমাকাশখানি সিন্দুর-রাগ-রক্তিমাতে সুরঞ্জিত হইয়াছে, যখন দেখিতাম কলকাকলি করিয়া বিহঙ্গমিথুনেরা ক্ষিপ্র-পক্ষে নিজ নিজ কুলায় অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে, যখন দেখিতাম নিঃশব্দ রাজধানীর নিশীথ গৃহবাতায়নের ছিদ্রপথ হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা বাজিয়া উঠিত।

পৌর্ণমাসী নিশীথের কৌমুদী-ধৌত ধবল স্নিগ্ধ রজনীতেও আমার অন্তরে তেমনি নিগূঢ় ব্যথা যেন সাগরের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত! আমার মনে হইত—আমি যেন নিতান্ত একা! এই বিশাল রাজপুরী, এই ব্যস্ত জনস্রোত, এই বিপুল নগরী পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু দাস দাসী সখী সাথী—আমার মানস-পট হইতে সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ক্রমশঃ আমার দেহের আরও পরিবর্তন ঘটিল; সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া যৌবন ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িল। যৌবনেরও ভার আছে—সে ভারে পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা লতার মত আমি যেন অবনমিত হইয়া পড়িলাম। সতত মনে হইত, সুপক্ক কাবুলী দাড়িম্বের মত রস-প্রাচুর্য্যে বুঝি আমি ফাটিয়া পড়িব।

আমি নবাবকন্যা—আমার এ রূপ দুর্লভ, আমার অনুগ্রহ কোনও মহাভাগ্যবানের লভ্য—এ অহঙ্কার নিঃশেষে অন্তর্হিত না হইলেও,

সেই অনাগত অজ্ঞাত জীবন-বল্লভের চরণতলে এই নারীজীবনের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ধন্য হইবার কামনা আমার মানসচক্রবালের দিগন্তসীমায় অল্প অল্প করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময়ে হিন্দুস্থানের সেই অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য্য মেহের খাঁর নাম শুনিলাম। মেহের খাঁর মত সঙ্গীতজ্ঞ সে সময় ভারতবর্ষে আর কেহই ছিল না। মেহের খাঁ, মেহের খাঁ—নাম শোন নাই? হাঁ হাঁ—দিল্লীর সেই স্বনামধন্য মেহের খাঁ।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধা কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিয়া, সজোরে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া, আবার যখন তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল—তখন তাহার কণ্ঠস্বর ভগ্ন, আর্দ্র এবং গম্ভীর। নবাবপুত্রী কহিতে লাগিল—

হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম। সঙ্গীতে আমার পিতার অত্যন্ত আনুরাক্ত ছিল। তিনি নিজে যে একজন খুব কলাবিৎ ছিলেন তাহা নহে, তবে তিনি আর সকল নবাব বাদশাহদের মত সঙ্গীতকে সরাবের উপকরণ মনে করিতেন না। তিনি এ বিদ্যাকে রাজ-সভায় সাদরে আসন দিয়া অভ্যর্থনা করিতেন, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পূজা করিতেন, এবং ইহার চর্চ্চাতে মুগ্ধ অভিভূত ও আত্মহারা হইতেন।

পিতা মেহের খাঁকে আনাইলেন। তাহার গানে নগরে এক নব উদ্দীপনা ছুটিল। সরকার হইতে উচ্চ বেতন দিয়া পিতা তাহাকে সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নবাবকে মেহের গান শুনাইবে এবং রাজধানীর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিবে—এই তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল।

শাপমুক্তি

মেহের খাঁ আসার দুই তিন মাস পরেই আমার মাতার মৃত্যু হয়। তখন পিতার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিষণ্ণ বলিয়া মেহেরকে প্রাতেও আসিয়া গান শুনাইতে হইত।

আমি প্রত্যহ ছাদে উঠিয়া সেই স্বরঝঙ্কার শুনিতাম। নিত্যই মুগ্ধ হইতাম, একদিনের জন্যও শ্রান্তি বা বিরক্তি অনুভব করি নাই।

মনে মনে মেহের খাঁর আকৃতি আমি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যার গানে সন্ধ্যায় কামিনীর কুঁড়ি ফুটিয়া উঠে, যার এস্রাজে সুরের ফুলঝুরি খেলে, না জানি সে দেখিতে কেমন!

সখীদের সঙ্গে এই কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা চলিত। একদিন এক সুরসিকা সখী বলিয়াছিল—"নবাবপুত্রী, আমি শুনিয়াছি, মেহের খাঁ দেখিতে ভারি কালো!"

আমি বলিলাম—"দূর! তাও কি সম্ভব। যার অমন কণ্ঠস্বর, সে কি কখনও কুরূপ হইতে পারে?" সখী কহিল—"সুর্মা কালো কিন্তু স্নিগ্ধ; সে নিজের কালিমা দিয়া মানবের চক্ষুকে সমধিক রমণীয় ও সুশ্রী করে। মেহের খাঁ কুৎসিত হইলেও, ত সুরের রূপবিকাশে সে যে অন্তরের সুর্মা!"

আমি বলিলাম—"তোর উপমা রেখে দে। মেহের খাঁ কালো, কোথায় শুনলি তুই?"

অবশেষে সে স্বীকার করিল, ও কথা সে শুনে নাই—তাহার কল্পনা মাত্র।—আমাকে রাগাইবার জন্য, আমার মন বুঝিবার জন্যই সে ও কথা বলিয়াছিল।

ইহার অল্প দিন পরেই, মেহের খাঁর কাছে আমার গান এবং এস্রাজ

শিক্ষার প্রস্তাব করিয়া পিতা আমার মত চাহিয়া পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, যাহাকে দেখিবার জন্য এতদিন ব্যাকুল হইয়া ছিলাম, তাহাকে যখন নিকটে পাইবার কথা হইল তখন মহামুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম, কি জানি, যদি সেই সখার কথাই সত্য হয়—সে যদি কালো কুৎসিতই হয়? তবে ত বড় দুঃখের কথাই হইবে! তার চেয়ে বরং তাহাকে না দেখিয়াই আছি ভাল।

অবশেষে মত দিলাম—কিন্তু মনটা বড় খারাপ রহিল!—এ কী করিলাম? তাহার গানের মত, তাহার সুরের মত যদি সে সুন্দর না হয়? তাহা হইলে কি করিব? সে দুঃখ কোথায় রাখিব?

আবার ভাবিলাম—সে রূপবানই হউক আর কুৎসিতই হউক, তাহাতে আমার কী? পিতা উহাকে দাম দিবেন—ও বিক্রেতা, ও সওদা দিবে—ব্যস! এই তো ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ! ওর রূপে আমার প্রয়োজন কি?—মনে মনে এইরূপ নানাবিধ তোলাপাড়া করিলেও—মনের খটকাটা কিন্তু কিছুতেই গেল না! আহা, মেহের খাঁ যদি সুন্দর ও সুপুরুষ হয়!

মেহেরকে দেখিবার জন্য আমার এত কেন উদ্বেগ---ইহার উত্তর কিছু খুঁজিয়া পাইতাম না! নিজের দেহের গোলকধাঁধায় আমি তখন নিজেই ঘুরিয়া ফিরিতেছিলাম—নিষ্ক্রমণের পথ তখনও নয়নগোচর হয় নাই—বোধ হয় এই কারণ!

অবশেষে, মেহের একদিন আমার সম্মুখীন হইল।—তাহাকে দেখিলাম—দেখিয়া বাঁচিলাম। না না—সে কুৎসিত নয়, কালো নয়—সে সুন্দর সুপুরুষ যুবক।—তাহাকে বড় লাজুক বলিয়া মনে হইল। পিতার

আদেশক্রমে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে আমায় গান ও এস্রাজ শিখাইতে লাগিল।

কাছাকাছি সামনা-সামনি আমাদের দু'জনের বসিবার আসন ছিল। আমার শিক্ষার প্রথম অবস্থায় পিতাও নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। লজ্জায় এবং সঙ্কোচে আমি সহজ ভাবে ওস্তাদজীকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিতাম না—পিতা মধ্যস্থ হইয়া তাহার চমক ভাঙাইয়া কহিয়া দিতেন। ওস্তাদ আপনার ভাবে সর্ব্বদাই মশ্গুল থাকিত।

ছয় মাস কাটিল! রূপবান পুরুষ ত পৃথিবীতে অনেকই আছে, কিন্তু মেহেবের রূপের মধ্যে অতি মধুর, অতি সুন্দর অতি করুণ একটা জ্যোতি দেখিতে পাইলাম। সেই জ্যোতি তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার আদব-কায়দা, একটু এলোমেলো হইলেও তাহা উপভোগ্য! তাহার চরিত্র—নির্ম্মল, সরল ও সুকোমল। তাহার ব্যবহারে মার্জ্জিতরুচির ও ভাবপ্রবণতার পরিচয়ই পাওয়া যাইত বেশী। মেহের অদ্ভুত! সে বাস্তবিকই সুন্দর!! সে নিজেই হাসে, নিজেই কাঁদে কোনও দিকে তাহার খেয়াল থাকে না। শিখাইতে শিখাইতে নিজের সুরে নিজের বাজ্নাতেই সে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। আমি তাহা ধরিতে পারিতেছি কি না সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। সময় সময় আমার রাগ হইত, বিরক্তি হইত, ভাবিতাম, লোকটা ক্ষেপিয়া গেল নাকি?

শিক্ষকের এই ভাবোন্মাদনায় প্রথমে কৌতুক, শেষে একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহার ভাবোন্মাদ অবশেষে আমার চিত্ত-দুয়ারে এক নূতন বাণী শুনাইল, মেহেরের গানের সুরে সে বাণী কেবলি আমার অন্তর মাঝে গুঞ্জরিয়া ফিরিত—

"আব' আগ' লাগি গ'য়ো
তেরা নজরিয়া!"

মেহেরকে আমার ভাল লাগিতে লাগিল। তাহার গুণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

আমার শিক্ষাও খুব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। একদিনেই এক একটা রাগরাগিণী আমি আদায় করিতে লাগিলাম। এস্রাজে হাত পূর্ব্বেই খুলিয়া গিয়াছিল। আমার শিক্ষাসাফল্যে আমার চেয়েও যেন আমার গুরুরই আনন্দ বেশী হইত। কতকগুলি গতে এবং কতকগুলি গীতে আমি গুরুকে এমনি অনুকরণ করিয়াছিলাম যে হঠাৎ কেহ ঠাও-রাইতেই পারিত না—এ গুরু কি শিষ্য!

সঙ্গীতের একটা মাদকতা আছে। ইহার নেশা শিরাজীর চেয়েও উগ্রতর। মেহের খাঁ সর্ব্বদাই সেই নেশায় চুর হইয়া থাকিত। ক্রমশঃ এ নেশা আমাকেও পাইয়া বসিল। মেহের চলিয়া যাইত, হয়ত ছড়ি বা টুপীটা নয় আর কিছু পড়িয়া থাকিত,—সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইত। আনন্দ-মদিরায় জ্ঞানহারা মেহের কতদিন নবাব-নন্দিনীকে বিদায়-কুর্ণিশ পর্য্যন্ত না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে—তাহারই কি কোন লেখাজোখা আছে? আমার নেশা যে—সে মাফ না চাহিতেই তাহার বেয়াদবী অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তেই আমি মাফ করিতাম!

কতদিন শেখা বন্ধ রাখিয়া ওস্তাদের জীবনকাহিনী শুনিতাম! সে বলিতে চাহিত না—কিন্তু হুকুমে বলিত।

মেহের কথা খুব কম কহিত। যে কথা না বলিলে নয়—তাহাও

শীঘ্র বলিতে চাহিত না। ঘাড় মাথা নাড়িলে যাহা চলিত, তাহা মেহের কথায় বলিত না।

তার কথা সে এমন কিছুই নয়! খুব সাধারণ রকমের সাদাসিধে কথা! বাল্যকালেই তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। একজন ফকীর তাহাকে প্রতিপালন করেন। আজ কোনও মসজিদে, কাল কোনও সরাইয়ে, তার পরদিন কোনও তরুতলে কাটাইয়াই সে মানুষ হইয়াছিল! ফকীর বেশ ভাল গাহিতে পারিত। সেই মেহেরের প্রথম গুরু। মেহেরের বয়স যখন ১৫ কি ১৬ বৎসর, তখন সে ফকীরের পরলোক ঘটে। তাহার পর মেহের দিল্লীতে এক বড় ওস্তাদের বাড়ীতে ভৃত্যরূপে রহিল। সেই ওস্তাদ পুত্রনির্বিশেষে মেহেরকে পালন করে, এবং গীত ও এস্রাজ প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষা দেয়। পনের বৎসর একাদিক্রমে শিক্ষালাভ করিয়া মেহের শিক্ষা শেষ করিল। তাহার না ছিল বাড়ী ঘর, না ছিল আত্মীয় স্বজন, না ছিল পুত্রপরিবার। সে বিবাহও করে নাই।

এই সহরেই তুমি তার অনেক কীর্ত্তিকথা শুনিতে পাইবে। মাসান্তে যেদিন মেহের বেতন পাইত, সেদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া হাসি ও পুলক গড়াইয়া পড়িত। প্রথম প্রথম ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকে চাপা হাসিতে পরস্পর বিদ্রূপ বিনিময় করিত; কিন্তু পরে মেহেরের আনন্দের আসল কারণ যখন প্রকাশ পাইল, তখন সেই বিদ্রূপকারীরাই অবনত মস্তকে মেহেরকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়াছিল।

যেদিন বেতন পাইত, সেইদিন মেহের ছুটিও লইত। মাসে একটি দিন মাত্র—নহিলে অসুস্থ হইলেও কখনও সে কামাই করিত না। সেদিন মেহেরের উৎসব—পরমোৎসব। শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া

সহরের যত নিরন্ন গরীব দুঃখীদিগকে লইয়া সেদিন সে ভোজন-সমারোহে আত্মনিয়োগ করিত।

সরকার হইতে কতবার তাহাকে ভাল ভাল পোষাক করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার সেই শতছিদ্র পুরাতন পোষাকটি আর ঘুচে নাই। রাজদত্ত নূতন পোষাক তাহার ঘর খুঁজিয়াও পাওয়া যাইত না! জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও উত্তর দিত না; বেশী পীড়াপীড়ি করিলে মুখখানি নত করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত।

বৎসর দেড়েক কাটিল। মেহের যতই চুপ করিয়া থাকে, আমি তাহার সঙ্গে ততই প্রগল্‌ভতা করি। আর তাহার কাছে আমার কোন সঙ্কোচই ছিল না। সে যে একজন অনাত্মীয় পুরুষ, আমি প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী; সে যে একজন বেতনভোগী ভৃত্য, আমি নবাবনন্দিনী—এ সকল বাধাও আর রহিল না। সে নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিত বলিয়া কখন-কখনও তাহার সঙ্গে হাসিতামাসা পর্য্যন্ত করিতে আমি আর কুণ্ঠাবোধ করিতাম না।

ইহা ভাল করিয়াছিলাম কি মন্দ করিয়াছিলাম—তাহা বলিতে পারি না, তবে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই তোমায় বলিতেছি।

নিজের মনকে যে ঠিক করিয়া পরখ করিতে পারে না—সে অপরের মন বুঝিবে কি করিয়া? মেহের যে কি ভাবিত, আমার মুখে বুভুক্ষিত দৃষ্টির জাল ফেলিয়া সে যে কী পদার্থ তুলিত, এস্রাজ শিখাইবার সময় অকারণে আমার কর স্পর্শ করিয়া সে যে কী লাভ করিত—তাহা তখন ভালই বুঝিতাম এবং তাহাতে বিশেষ কৌতুকই অনুভব করিতাম। একে আমার বংশমর্য্যাদা, উচ্ছ্বসিত যৌবন, লীলাচঞ্চল রূপরাশি আমার শিরা-

উপশিরাগুলিতে পর্য্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহার উপর মেহেরের নীরব পূজার ময়ূরপঙ্খীটিও যখন আমারই ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পুলকদর্পে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিলাম। নবাবকুমারীর যৌবন-সমারোহে তাহার এ যেন দেয় রাজস্ব; রাজার পদপ্রান্তে প্রজার এ যেন নজরানা! এ যেন দাসের কর্ত্তব্য; ভক্তের পূজা।

মেহেরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকে হতভাগিনী আমি এমন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। যে আমার গুরু, যে আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে র: ণীয় মনে করিত, যে আমার জন্য জগতের কঠিনতম পরীক্ষা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই—তাহাকে আমি যে ঘৃণা ও উপহাস করিয়াছি, তাহার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? ষাট বছরের অশ্রুতেও তাহা ধৌত হয় নাই, এত পরিতাপেও তাহা দগ্ধ হয় নাই, এত অনুশোচনাতেও তাহার দাগ মুছে নাই!

ভাস্কর ও চিত্রকর তাহাদের ধ্যানের দেবতাকে রূপ দিয়া মূর্ত্ত করিতে পারে, কিন্তু গায়ক ও কবি তাহা পারে না বলিয়া কেবল বেদনাই নিবেদন করে। তখন আমি তাহা জানিতাম না! আমি পাষাণী, আমার অন্তরে তাহার বেদনা বিদ্রূপেরই সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহার পূজা আমার কাছে তোষামোদ বলিয়াই মনে হইত। হায় নবাবজাদী, আজ কোথায় তোমার সেই রূপ যৌবনের উন্মাদনা! কোথায় তোমার সেই বংশমর্য্যাদার অহঙ্কার!

যাক্ ও-সব কথা—যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। একদিন মেহের অত্যন্ত বাচাল হইয়া উঠিল। সেদিন প্রথমটা তাহার ব্যবহারে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার আনন্দ সেদিন গুলাবফোয়ারার মত শতধারে ছুটিয়াছিল। সে যে কী বলিয়াছিল আজ তাহা ভাল স্মরণ

নাই। কিন্তু সে কথা আর কথনও কাহারও কাছে তাহার পূর্ব্বে শুনি নাই।

সে এক নূতন কথা। সে দ্রাক্ষাবস, সে তীব্র বিষ। সে কথা—বেদনার মত জ্বালাময়, অথচ চুম্বনের মত সুখস্পর্শা। সে যে কী বলিয়াছিল আজ তাহা কল্পনা করিতে পারি মাত্র, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না।

মেহেরের পক্ষে এ কার্য্য খুবই বোধ হয় সহজ ছিল। সে স্বাভাবিক ভাবেই বলিয়াছিল। প্রকাশেই প্রতিভার আনন্দ। মেহের কি কম প্রতিভান্বিত? এই দেখ—আমি যে রূপগর্ব্বিতা নবাবপত্নী, আমার মধ্যে এত দীনতা, এত নীচতা ছিল, তাহা কি কোনও নবাবপুত্র বা বাদশাহপুত্র আসিয়া দেখাইয়া দিতে পারিত? মেহের কত বড় প্রতিভাশালী—সে আজ যাঠ বছর ধরিয়া কেবল আমাকেই গড়িতেছে। আমার এস্রাজেই সে পর্দ্দা ঠিক করিতেছে, আমাব কণ্ঠেই সুর যোজনা করিতেছে!

ক্রমে নবাব সাহেবেব কর্ণগোচর হইল যে, মেহের খাঁ নবাবদুহিতার পাণিপ্রার্থী। গৃহহীন ভিক্ষুকের স্পর্দ্ধা দেখিয়া নবাবের উষ্ণ রক্ত উষ্ণতর হইয়া উঠিল। নবাবজাদীও বাতুলের এই প্রলাপোক্তি শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। আমার পাণিপীড়ন করা কত কত আমীর ওমরাহের দুরাশা, নবাবপুত্রের স্বপ্ন, বাদশাজাদার আকাঙ্খা। আমাকে বাঞ্ছা করিয়া বসিল কি না—এক পথেব ভিখারী? কী হাস্যকর ব্যাপার—অসম্ভব! বাতুলতা—।

কোথায় আমার মেহেদী-রঙীন চরণনখরে কন্দর্পদর্পহারা নবাবপুত্র আসিয়া নত নয়নে আত্মসমর্পণ করিবে—না ছিন্নবসন উন্মাদ রুদ্র মেহের খাঁ—

মেহের খাঁকে পিতা খুবই ভালবাসিতেন। তাই, তাহার গোস্তাকীর অত্যন্ত লঘু দণ্ডই হইল। হুকুম হইল. তিনদিনের মধ্যে তাহাকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে! তাহার প্রাসাদ-প্রবেশ বন্ধ হইল।

দণ্ডের কথা প্রথম যখন শুনিলাম—ভাবিলাম, এ শাস্তি শাস্তিই হয় নাই। এত বড় অপরাধের এই মাত্র শাস্তি?

কিন্তু মেহের চলিয়া যাওয়ার পর আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ব্যথার মেঘ ঘনাইতে লাগিল মনে হইল, নির্ব্বাসন যেন আমারই হইয়াছে! মেহেরের স্মৃতি মনের মাঝে কাটার মত কেবলই খুচ্‌খুচ্‌ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। যতই প্রফুল্ল হইতে চাই—মনটা ততই ভাঙ্গিয়া পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত সুখ ক্রমশঃ বিস্বাদ হইয়া গেল—এ রূপ যৌবন জঞ্জাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! কতবার মনে করি—আমি নবাবপুত্রী—কে মেহের খাঁ? যেখানে ব্যথা. হাত সেইখানেই ফিরিতে লাগিল। জোর করিয়া তাহাকে যতই ভুলিতে চাই—তার কথা ততই মনের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে!

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে সারাদিনের দাহজ্বালা যখন পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রগাঢ় রক্তিম আভায় তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল, তখন মেহেরখাঁর স্মৃতিগুলি তপ্ত লৌহের মত আমার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল। অনাকাঙ্ক্ষিত উপেক্ষিত মেহেরকে বড় আপনার, বড় মধুর, বড় প্রিয় মনে হইতে লাগিল. কিন্তু কোথায় মেহের?

চতুর্দ্দশী রজনীর অগাধ জ্যোৎস্না সমস্ত আকাশখানাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড তপ্ত পাথরের মত মনে হইল! গুবাক্-তালী-খর্জ্জুর-বীথির মাঝে পূর্ণচন্দ্রকে জীর্ণ চীরান্তরালে শূন্য

ভিক্ষার থালা বই আর কিছু ভাবিতে পারিতেছিলাম না—এমন সময় পিতা পিছন্ হইতে ডাকিলেন—আমিন্।

যত দূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোলাপবনের পাশে পাশে, বকুল তরুর তলে তলে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সাদী হাফেজ কত কাব্য আলোচনা করিলাম; ইমন্ কল্যাণের মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করিলাম—কিন্তু মনের কাঁটা ঘুচিল না।

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখিয়া, ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটা অদ্ভুত আমি যেন কোথায় গিয়াছি; কে যেন আমাকে কুর্ণিশ করে নাই বলিয়া, আমার আজ্ঞায় তাহার শিরশ্ছেদ হইয়াছে। নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া রাজদরবারে যখন নীত হইলাম—তখন দেখি সে এক নূতন দেশ। সেখানে গানেই সব কায হয়। গানেই তাহারা কথাবার্ত্তা কহে। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—বিচারক মেহের খাঁ। মেহের খাঁই সে গীত-রাজ্যের বাদশাহ!

মেহের—বাদশাহ। হুকুম দিল—"নির্ব্বোধ নারী, ছাড়িয়া দাও।"

আমি বিচারে মুগ্ধ হইয়া বলিলাম—"আমি শাস্তি চাই!" কিন্তু বাদশা আবার হুকুম দিল—"শাস্তি দিবার মালিক মানুষ নয়, পরমেশ্বর।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি যে দেওয়ালের গায়ে এস্রাজ দু'টি জালায়নপথাগত উষার বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। আর সেই কম্পনে তারে তারে গুঞ্জন উঠিতেছে!

রাত্রির অন্ধকারে চিন্তাগুলি মশকের মত সর্ব্বাঙ্গে দংশন করে, কিন্তু দিনে তাহারা অনেকটা অদৃশ্য হয় তাই দিনটা কোনও মতে কাটিল।

শাপমুক্তি

আবার সন্ধ্যা আসিল। অন্তঃপুরোদ্যানের যেখানে আমি প্রতিদিন বসি, সেদিনও সেইখানে বসিয়া আছি। ফাল্গুনের পার্ব্বণবিধু পূর্ব্বাকাশে সুখস্বপ্নের মত বিপুল পুলকে হাসিয়া উঠিয়াছে—আমি অলস হইয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি, মেহের আসিয়া উপস্থিত!... এ কি?

আমার অন্তরলোকের পরীবালিকারা চকিত সুপ্তোত্থিতের মত রোমাঞ্চের বেদীতে দাঁড়াইয়া অবহেলিত অপমানিত মেহেরকে সাদরে অভিবন্দনা করিয়া উঠিল। মন প্রাণ এক বাক্যে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার সকল গর্ব্ব পুলকাশ্রুতে গলিয়া পড়িল। তাহার পানে চাহিয়া শুধু বলিলাম—"প্রিয়তম।"

মেহের—সেই বিহ্বল ভাবোন্মত্ত মেহের! দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই! একেবারে স্বচ্ছন্দে আসিয়াই আমার পদপ্রান্তে তৃণের উপর বসিয়া পড়িল। আমি যে তাহাকে কী বলিব, কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। হঠাৎ আমার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল!

পিতার আসিবার সম্ভাবনা। তিনি আসিয়া যদি এই দৃশ্য দেখেন, তবে হয়ত আমাদের উভয়েরই এখনি জীবনলীলা শেষ হইয়া যাইবে! নিজের প্রাণের ও মানের উপর অত্যন্ত মমতা জন্মিল। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপিতেছিল। আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না—সমস্ত কণ্ঠনালী শুকাইয়া যেন মরুভূমি হইয়া গেল!

দুইদিন যাহার অদর্শনে আমি দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াছি, তাহাকে বক্ষের অতি-নিকটে পাইয়াও যে সমাদর করিতে পারিতেছি না, এটা যেমন সূচির মত আমায় বিঁধিতেছিল, সেই সঙ্গে মনে ইহাও হইতেছিল,

যেন শত শত গুপ্ত প্রহরী আকাশে বাতাসে ঘাসে লুকাইয়া আছে,—বাক্যস্ফুরণ হইবামাত্রই তাহারা পিতাকে আনিয়া সে কথা শুনাইয়া দিবে; আর তাহার ফল—জল্লাদের হস্তে অপমৃত্যু। চক্ষু তাই মেহেরের পানে না চাহিয়া, লুকানো চরের সন্ধানেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মেহের কিন্তু সহজ সরল অবিকম্পিত কণ্ঠে সসম্মানে কুর্ণিস করিয়া কহিল—"শাহজাদী, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার শেষ রাত্রি। তাই যাবার আগে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আশীর্ব্বাদ করি—"

—"লুকোও, শীগ্‌গীর লুকোও—ঐ জালার মধ্যে—ঐ জালার মধ্যে—জালায়।" বলিয়াই আমি তাহার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলাম!

অদূরে পিতা। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। মেহের তবু জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? কী হয়েছে?"

ভয়কম্পিত কণ্ঠে আদেশ করিলাম—"নবাব আসছেন। আমায় যদি ভালবাস, আমায় কলঙ্ক হতে রক্ষা কর। শীঘ্র তুমি ঐ জালার মধ্যে প্রবেশ কর, শব্দ করো না।"

মেহের আর দ্বিরুক্তি করিল না। হুকুম তামিল করিতে তৎক্ষণাৎ জালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রকাণ্ড মানুষ সমান উঁচু তামার একটা জালা অগ্নিহীন চুল্লীর উপরে রক্ষিত ছিল। উদ্যানমধ্যস্থ মাটির পথে ঘাস গজানো নিবারণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল গরম করিয়া ছিটান হইত। মেহের যেমন তাহাতে প্রবেশ করিল, অমনি নবাবও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার মুখখানা বজ্রগর্ভ বর্ষনোন্মুত মেঘরাশির মত। মালীকে 'ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জালায় জল আছে?"

"আছে, খোদাবন্দ্।"

"এখনি চুল্লীতে আগুন দে। গরম জল ক'রে উত্তর দিকের ঐ পথে ঢেলে দে।"

অকস্মাৎ কে যেন আমার বক্ষপঞ্জরে ছুরিকাঘাত করিল।

নবাবের হুকুম। তখনি জালার নিম্নে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি দুই তিনবার ডাকিলাম—বাবা—বাবা—বাবা—

বাবা নিরুত্তর, গম্ভীর। লজ্জা যদি এড়াইলাম, তো ভয় আসিয়া গলা চাপিয়া ধরিল। কতবার মনে করিলাম, প্রকাশ যখন হইয়াই গিয়াছে, তখন বলিয়া ফেলি—মেহের রক্ষা পাক।

কিন্তু বলা আর হইল না। টগ্‌বগ্ শোঁ। শো। শো। করিয়া—জালার মধ্যে জল ফুটিতে লাগিল। কৈ? মেহেরের তো কোন আর্ত্তনাদও শোনা গেল না?

তারপর, আর জানিনা। কে যেন আমার নাক টিপিয়া ধরিল—আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল, আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি হকিম বৈদ্য চিকিৎসকে আমায় ঘিরিয়া বসিয়া আছে, আমি আমার মহলে, পালঙ্কে শায়িত।

মুর্চ্ছার ঘোরেও শুনিয়াছি, জাগিয়াও শুনিতে লাগিলাম, মেহের যেন তাহার সেই প্রিয় গানটি গাহিতেছে—

আশ্‌কাঁ কুশ্‌ত্‌গাঁ মাশুক্ আন্দ্
বড়্ নেয়ারেদ্ যে কুশ্‌ত্‌গাঁ আওয়াজ॥

মনে আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ও গান গায় কে ?"

সকলেই বলিল—"কৈ, গান তো কেউ গায় নাই।"

কালস্রোতে সব ভাসিয়া গিযাছে। নবাববাড়ী, নবাবজাদী সব গিয়াছে। আছি শুধু আমি—নরহত্যার আসামী, নির্ব্বোধ নারী। পরমেশ্বর শাস্তি দিবেন !

এইই সেই উদ্যান। যেখানে মেহের আমার ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছে, জ্বলিযা পুড়িয মরিযাছে তবু শব্দটি করে নাই—এইখানে—ঠিক এইখানে মাটীর নীচে দগ্ধাবশিষ্ট আমার জীবনমরণের. গুরু, ইহপরকালের পথ-প্রদর্শক যথাসর্ব্বস্ব মেহেব খাঁ অনন্ত নিদ্রায শায়িত।

ওই শোন সে গাহিতেছে—

আশ্‌কাঁ কুশ্‌ত্‌গাঁ মাশুক্ আন্দ্।
বড্ নেয়াযেদ্ যে কুশ্‌তগাঁ আওয়াজ।

তুমি শুনিতে পাইতেছ না. বাবু ?

*　　*　　*　　*

নিদ্রাভঙ্গে শয্যায উঠিযা বসিযা, এই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। নবাবজাদী নহে, একজন বাদশাহজাদী সম্বন্ধে এইরূপই একটি কাহিনী মোগল ইতিহাসের একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে বটে। কিন্তু যে গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত আছে, তাহাকে বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ আর প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন না—এবং এ কাহিনীটিকেও তাঁহারা অলীক বলিযাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু. কি অদ্ভুত স্বপ্ন।

আমার জীবন

(১)

"আমার এ জীবনকাহিনী আমি লিখিতাম না"—আত্মজীবনচরিত-রচনাকারী অনেকেই এই বাক্যটির দ্বারাই গ্রন্থারম্ভ করেন। লিখিবার একটা না একটা অনিবার্য্য কারণও সঙ্গে সঙ্গে দর্শাইয়া থাকেন। আমি সুতরাং ও পথ পরিত্যাগ করিলাম। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন, আমি খোস-মেজাজে বলিতে পারি না—কিন্তু সুস্থ দেহে বহাল-তবিয়তে এবং বিনা কাহারও অবৈধ উত্তেজনায় (undue influence)এ আমার এই জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আর একটী কথা। অনেকেরই আত্মচরিত হইতে বিনয়ের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া এই উপদেশবাণী ফুটিয়া উঠে—"আমার মত কে আছে ? অতএব, হে পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা সকলে আমার মত হইতে চেষ্টা করিবে।" কিন্তু আমার এই কাহিনীর উপদেশ—"সাধু সাবধান—আমার মত কেহ হইতে চেষ্টা করিও না।"—যদি একজন মনুষ্যও ইহা পাঠে সাবধান হয়, তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি ভূমিকা অথ মুখবন্ধ—এইবার আরম্ভ করি।

এখন আমার মাসিক পত্র উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ হয়ত আমায় চিনিতেই পারিবেন না, তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি আমি ভূতপূর্ব্ব "অঞ্জলি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ঠিক কত বয়সে এই বঙ্গসাহিত্য-সেবারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি আমায় আক্রমণ

করিয়াছিল, তাহা সঠিক বলিতে পারি না। বয়স কমাইয়া, অতি শৈশবাবস্থায় আমার হৃদয়ে কবিত্বের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল বলিয়া নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করিব না। তবে এটা বেশ মনে আছে, স্কুলে খুব নীচে ক্লাসে যখন পড়িতাম, তখন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্নদামঙ্গল পড়িয়া পড়িয়া "পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে" পদ্য লিখিতাম বটে। তখন 'কবিতা' নামই চলিত হয় নাই—সমিল পদকে লোকে পদ্যই বলিত। কি যে লিখিতাম তাহা আজ একেবারেই মনে করিতে পারি না, কিন্তু লিখিতাম খুবই।

একখানি শ্রীরামপুরে কাগজের খাতা ছিল—তাহাতে সেগুলি নকল করিয়া তুলিয়া রাখিতাম। এ সময়টা ছিল ভালই। কোন জ্বালা যন্ত্রণা আশা দুরাকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না। লিখিতাম মাত্র। তাহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে। পড়ার ডেস্কের ভিতর অনেক পুরাতন খাতার মধ্যে আমার সেই পদ্যের খাতাখানা লুকান থাকিত।

বাবা দম্মাহাটায় লোহার আড়ত করিয়া বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। কলিকাতায় একখানি বাড়ীও করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি ধনীর সন্তানই ছিলাম বলিতে হইবে।

আমার নিজের আর ভাই বা ভগিনী কেহই ছিল না। পিতা মাতার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া আমার আদর যত্ন একটু বেশী পরিমাণই ছিল। না হইবে কেন? প্রৌঢ় পিতামাতার—কত ভাগ্যের আমিই একমাত্র বংশধর। আমার বাঁচাই যে তাঁহাদের একমাত্র কামনা!

পিতামাতা মনে না কষ্ট পান, সেই জন্য আমারও প্রধান চিন্তা হইয়া

উঠিল, কি করিলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি। বুড়া বাপ মায়ের মুখ চাহিয়া এই দিকেই আমায় অধিক মনোনিবেশ করিতে হইল। কাযেই লেখাপড়ার তত সুবিধা হইল না।

বাবা আমায় প্রথমে ত স্কুলেই যাইতে দিতেন না, পাছে একাকী কোনও বিপদ বাধাইয়া বসি। পরে ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া চাকরের কোলে বসিয়া স্কুলে যাইতে লাগিলাম। তখন আমি বেশ বড় হইয়াছি মনে আছে, কিন্তু কত বড় তাহা বলিতে পারি না। কারণ, মনে আছে এই স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আমাকে "খোকাবাবু এসেছে রে, খোকাবাবু এসেছে" বলিয়া নানারূপ পরিহাস করিত। কেহ কেহ "নির্ভীক সমালোচকের" মত রূঢ় ভাষায় বলিত—"ধেড়ে ছেলে, আবার কোলে চড়ে আসা হয়েছে।" এই প্রথম ধাক্কা খাইয়া কোলে বসিয়া আর স্কুলে যাইতাম না।

বাপ মায়ের জীবনানন্দ হইয়া দিন দিন বেশ বাড়িয়া চলিলাম। কোনও ভাবনা নাই। পৃথিবীর সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা আমার ছাত্রজীবন অনেক বেশী সুখের ছিল। কারণ, স্কুলে বা বাড়ীতে কখনও কেহই আমায় একদিনের জন্যও পড়িতে তাগাদা করেন নাই। এ জন্য এখানে আমি আমার শিক্ষকদের নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বড় লোকের ছেলের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মত, লেখাপড়াও ধীরে ধীরে নীরবে চলিতে লাগিল। ফলে, এক এক ক্লাসে দুই বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত চলাফেরা করিয়া অবশেষে এক শুভদিনে আমি প্রবেশিকার তোরণ দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে দ্বার পার হওয়া কিন্তু আমার সাধ্যাতীত হইল। সুতরাং স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার আরও এক কারণ ঘটিল, এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স বিশ বৎসর।

আমার দূর সম্পর্কীয় অমূল্যদাদা বহুদিন পরে বাঁকীপুর হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি একজন কবি। কয়েকখানি মাসিকপত্র খুলিয়া তিনি নিজ রচনাও আমায় দেখাইলেন। আমি সেগুলিকে "পদ্য" বলিলে তিনি আমায় বুঝাইয়া দিলেন যে ও শব্দটা নিতান্ত গ্রাম্য—এখনকার লোকে বলে "কবিতা।" মাসিকপত্রও এই প্রথম দেখিলাম। আমার পিতার আডতে কখনও উক্ত পদার্থের নামও শুনি নাই।

অমূল্যদাদাই হইলেন সাহিত্যে আমার দীক্ষাগুরু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিত্বরূপ এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল—এখন সে ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আমি যাবতীয় মাসিকপত্রের গ্রাহক হইলাম। উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত মাসিকেই অমূল্যদাদা রচনা পাঠাইতেন।

যে সকল বড়লোকের নাম শুনিতাম, তাঁহাদের লেখাগুলি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতাম; আর খুঁজিতাম বড় লেখার সেই লুকানো কলকাঠিটি কোথায়। সেটার যদি একবার কোনও প্রকারে সন্ধান পাই তো আমায় আর পায় কে? কিন্তু সে মায়ামৃগের কোনও সন্ধান পাইলাম না। নাচারেই, মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলি আগে পড়িয়া তাহাদের ভাব, কতক কতক ভাষা, ভাল মনোমত শব্দ চুরি করিয়া, আমি নূতন করিয়া আবার কবিতা লিখিতে সুরু করিলাম।

শাপমুক্তি

পিতৃবিয়োগের পর একবৎসর গত হইলে আমার বিবাহ হইল। সুন্দরী দেখিয়াই বিবাহ যে করিয়াছিলাম ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য!

বিবাহের পূর্ব্বে সব কবিতাই মানসী-প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত হইল কিন্তু ইদানাং হাতের গোড়ায় পাইয়া বধুর স্কন্ধেই আমার কবিতা চড়িয়' বসিল। সে বালিকা। তখন তাহার বয়স মাত্র একাদশ। সে বেচারী অস্থির হইয়া উঠিল। একা আমার কাছে আসিতে সে আতঙ্কিত হইত—পাছে কবিতা শুনিতে হয়। কলিকাতার বাসায় বসিয়া সে "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে বিদুষী ঠাওরাইয়া মনে মনে অপূর্ব্ব পুলক ও প্রসাদ অনুভব করিতাম। সুতরাং কবিতায় ভাবা, কবিতার স্বপ্ন দেখা—পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যই আমি তখন কবিতাতে সম্পন্ন করিতেই চেষ্টিত হইলাম।

(২)

চারিবৎসরে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। চটিয়া স্ত্রীকে কবিতা শোনান বন্ধ করিয়া দিলাম।

ভাল প্রাণের প্রাণ আমার কেহ ছিল না যে প্রাণ খুলিয়া দুটা কথা কই। মাসিকপত্রে আমার লেখা নাই বা প্রকাশ হইল—আমি কবি ত বটে। আমি যে কবি, তখন এ বিশ্বাসটুকু আমার দৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং কবিতা শোনাইবার লোক খুঁজিতে লাগিলাম। আর শুধু তো শোনাইলে চলে না—"কেমন লাগলো"—এই প্রশ্নের যাহা ভদ্রতাসঙ্গত একমাত্র উত্তর, তাহার মধ্যে যে কী সুধা সঞ্চিত আছে, তাহা আর লেখকশ্রেণীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নিজের লেখা

যত বেশী লোককে নিজে পড়িয়া শোনান যায়, লেখকের তত বেশী চরিতার্থতা। কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ তৃপ্তিসুখ তখনও পর্য্যন্ত ভালমত ঘটে নাই। এজন্য প্রাণে সর্ব্বদাই একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতাম। দুটি একটি কবিতা রোজই লিখিতাম; কিন্তু উক্তরূপে শোনাইবার লোকাভাবে—সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম আমার দমিয়া আসিতে লাগিল।

শুধু লিখিয়া ফলই বা কি? অমূল্যদাদার মত, ছাপাইবার ব্যবস্থা কেমন করিয়া হয়? ভাল ভাল চিঠির কাগজে, খুব ধরিয়া ধরিয়া; সাধ্য-মত স্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে কবিতাগুলি নকল করিয়া, ২।১টি করিয়া সমস্ত মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ফেরৎ-প্রাপ্তির জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিটও সঙ্গে পাঠাই।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এমন, যে অধিকাংশ কবিতাই বামদিকের কোণে "অমনোনীত" লিখিত হইয়া ফেরৎ আসে। কোন কোনও কাগজ ওয়ালা ছাপেনও না, ফেরতও দেন না, টিকিটখানি আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদিগকে চিঠির পর চিঠি দিই, উত্তর নাই।

অবশেষে গ্রাহক নম্বর দিয়া কবিতা পাঠাইতে সুরু করিলাম। কাগজ ছাড়িয়া দিবার যখন ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলাম—তখন কেহ কেহ দশটির মধ্যে বাছিয়া একটি ছাপিতে লাগিলেন। প্রাণ বাঁচিল—হাতে স্বর্গ পাইলাম।

বছর চারেক এইরূপ উমেদারী করিয়াই আমি 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি' হইয়া উঠিলাম—অর্থাৎ বহি ছাপাইলাম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল।

শাপমুক্তি

সাহিত্যিক সভায় যাই, সাহিত্যিকদিগকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করি, "বেঙ্গলী"তে সেই সব সংবাদ বাহির হয়, আর বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠে। এইরূপে আরও তিন বৎসর কাটিল।

প্রায় সমস্ত সম্পাদকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ আমার নানাবিধ সদ্‌গুণ এবং বিপুল প্রতিভা দেখিয়া, ছোট গল্প লিখিতে উপদেশ দিলেন। অনেক সম্পাদকই বলিলেন—"কবিতা, মশায়, আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি পাই—কিন্তু ছোট গল্পের বড় অভাব। অথচ ঐটেই সবাই পড়ে। আর গল্প নৈলে মাসিকও চলে না। কবির চেয়ে গল্প-লেখকেরই আজকাল আদর বেশী।"

বুঝিলাম, কবিতা যতই ভাল হউক না কেন, উদীয়মান কবি ছাড়া সে মধুর অন্য ভ্রমর নাই ; কিন্তু গল্প যেমনই হউক, সেটি পড়িবে না মাসিক পত্রের এমন পাঠক অতি বিরল।

গল্পলেখকদের অধিক আদর ? তথাস্তু। কবিতা লেখা ছাড়িলাম। গল্প ধরিলাম।

কবিতা ছাড়িবার আরও কারণ ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যেই আমার চারিখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতরে যাহাই থাকুক্ না কেন, ছাপা বাঁধাই কাগজ ও আপন আলোকচিত্রে বই কয়খানিকে যত-টুকু সম্ভব শোভন করিয়াছিলাম। সুন্দর মরক্কো চাম্‌ড়ার বাঁধাই—যার মলাটের দামই অন্ততঃ দুই টাকা—আর্ট কাগজে ছাপা, এক পৃষ্ঠার পদার্থকে চারিপৃষ্ঠায় বাঁটিয়া বইয়ের আয়তন বাড়াইয়াও দাম নাম মাত্র একটাকা ধার্য্য করিলাম—কিন্তু তথাপি চারিখানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে একখানি পুস্তকের এক-চতুর্থাংশ খরচ পর্য্যন্তও উঠিল না।

বিজ্ঞাপনের কসুর করি নাই। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক—সমস্ত কাগজে কবির ফটো ও বইয়ের ব্লকসহ মাসে মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলাম। সমালোচনাও ভাল রকম হইয়াছিল, কিন্তু হায়রে বাঙ্গালা দেশের "ভবী"গণ! কিছুতেই তাহারা ভুলিল না। আমার বই বিক্রয় হইয়া টাকা উঠিল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা নয়। আমার ইচ্ছা পুস্তক প্রচার—নাম-প্রচার! এ দু'য়ের একটিও হইল না, এই দুঃখ! এ কি কম দুঃখ? কবি ছাড়া কবির এ ব্যথা জগতে আর কেহই বুঝিবে না!

কবিতা দ্বারা যখন উক্ত কার্য্য 'সিদ্ধ' না হইয়া 'দগ্ধ'ই হইল, তখন কবিতা ছাড়িব না কেন?

আর একটা কথা। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা—বিজ্ঞাপন অনুসারে নহে—সত্য সত্যই—শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক, তাঁহারাও জীবনের আদিম বর্ব্বরাবস্থায় কবিই ছিলেন। কবিতাতেই তাঁহাদের হাতে খড়ি। আমার সঙ্গে মিলিয়া গেল। আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক—আমার কপালে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের অমর যশ যে অলক্ষ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—তাহা আমি দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। আমি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক।

পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে গল্প লিখিলাম। তাহার অনেকগুলি মাসিক পত্রে বাহিরও হইল।

কবিতার পিণ্ড ছাড়িয়া, গল্পের ষোড়শ করিয়া পাঁচ বৎসর বঙ্গভারতীর মাসিক ক্রিয়া করিলাম। পাঁচখানি গল্পপুস্তকও ছাপিলাম। তবু দেখি, গল্পলেখক বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্যই করে না। কোনও প্রসঙ্গে গল্প-

লেখক ও ঔপন্যাসিকের নাম করিতে হইলে, বহুকালশ্রুত সেই কয়জনের নামই লোকে করে, আমার নাম ভুলিয়াও কেহ করে না। রাগে অভিমানে আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

(৩)

গত বৎসর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে—এবার পত্নীও স্বর্গারোহণ করিলেন।

চারিটি শিশু কন্যা রাখিয়া পত্নী যখন এমন অকালে চলিয়া গেলেন—তখন দুঃখিত অপেক্ষা বিপন্নই আমি বেশী হইয়াছিলাম। ঘরে আমার বৃদ্ধা বিধবা পিতৃস্বষা ও তাঁহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন, সেই অনেকটা সুবিধা হইল। আমার দিদি শিশুগুলিকে পালনের ভার লইলেন। আমি অকূলে কূল পাইলাম।

এক মাস যাইতে না যাইতেই, তাঁহারা আবার আমায় সংসারী হইয়া পুত্রমুখ দর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সে কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলাম না।

পত্নীবিয়োগে আমি যে দুঃখিত হই নাই তাহা নহে,—তবে সত্য কথা বলিতে গেলে, সে দুঃখটা কাল্পনিকই বেশী কাজেই সে শোকপ্রকাশের ভাণও হইল অতিরিক্ত। যদিও সন্ন্যাসী হইয়া লোটাকম্বল লইয়া সংসার ত্যাগ করিবার মৎলব করি নাই, কারণ তাহাতে অনেক বিঘ্ন, তবে পত্নীর শোকে এই সুযোগে আর একখানি "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" যে লিখিব, এ প্রতিজ্ঞা শ্মশান হইতে ফিরিবার পথেই করিয়াছিলাম। সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই একখানি বহির মত কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কতক মাসিকেও ছাপা হইল, বাকী মাসিকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া

একেবারে কাব্যাকারে প্রকাশ করিলাম। পত্নীর নাম ছিল মায়া, কাযেই কাব্যের নাম রাখিলাম "মায়ার ডোর"।

বিপত্নীক হইয়া অন্ততঃ একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলাম। এতদিনে আমার দৃঢ়বিশ্বাসও হইল যে, এইবার আমি বঙ্গসাহিত্যে সত্য সত্যই বিখ্যাত এবং অমর হইব। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া জলধর সেন প্রভাত মুখুয্যে অবধি বঙ্গ-ভারতীর কত কত বরপুত্র বিপত্নীক —অন্ততঃ প্রথম পক্ষের স্ত্রী ইঁহাদের কাহারও জীবিত নাই।

আরও ভাবিলাম, এইবার সাহিত্যচর্চ্চায় ষোল আনা মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা হইল। সাহিত্যসেবাও একপ্রকার সন্ন্যাস—সুতরাং বিবাহ আর কোন মতেই করা যাইতে পারে না।

বয়স আমার তখন ৩০।৩১—পূর্ণ যৌবন, অন্নচিন্তা ছিল না, রক্ত গরম, সবই সাজিত।

যাহা হউক, এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমি এক রকম আশ্বস্ত হইয়াই কাগজে কাগজে "মায়ার ডোর" সমালোচনা করিতে পাঠাইলাম।

ভাবিয়াছিলাম, সকল কাগজেই বহিখানির অজস্র প্রশংসা হইবে; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। অধিকাংশ কাগজেই বহিখানির নিন্দা বাহির হইল।

বুঝিলাম—সাহিত্যের বাজারে আমার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ভিতর হইতে হৃদয়দেবতা ঢক্কানিনাদে কেবল আদেশ করিতে লাগিলেন—"বৎস নিরীহ নির্দ্দোষী নবীন, যদি বঙ্গসাহিত্যে যশে অমর হইতে চাও, তবে এ অন্যায়ের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ কর।"

শাপমুক্তি

সমস্ত সম্পাদকের প্রতি আমার আক্রোশ বাড়িয়া উঠিল। শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে মূলতঃ ইহারাই অধিকতর দোষী।

আমার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যখন কতকগুলি অর্ব্বাচীন যুবক সমালোচক আমার লেখাকে যাচ্ছেতাই বলিতেছে, প্রবীণ লেখককে সম্মান না করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে, তখন তাহা যে রাস্কেল-প্রকৃতি সম্পাদকগণের ইঙ্গিতেই হইতেছে—সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

বুক বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও কাহাকেও লেখা দিব না —দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিয়া গেলেও, না! দেখি কেমন মাসের ঠিক পয়লা তারিখে তাহাদের কাগজ বাহির হয়! আমার গল্প এবং কবিতার জন্য নিশ্চয়ই আটকাইয়া যাইবে—তখন এই অশরণের শরণ লইতেই হইবে।

এই ভরসায় সম্পাদকদিগকে খুব কড়া করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে কাগজে আমার নিন্দা বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকে তাদৃশ রচনা প্রকাশ করার জন্য বিস্তর ভৎর্সনা করিয়াই পত্র লিখিলাম। তাহারা জবাব দিল—"মশায়, অমুককে জানেন না? তাঁর লেখা ফেরৎ দিই কি করিয়া?—তা ছাড়া, আমরা কোনও লেখকের স্বাধীন মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করি না।"

দুই দিন—দশ দিন—বিশ দিন—এক মাস—দুই মাস—অপেক্ষা করিলাম—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত আসিল না। বোধ হয় সবাই চটিয়া গিয়াছে। রাস্তায় কোন সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কত প্রকার আলাপ

পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা করেন, কিন্তু লেখা চাহেন না। আমার গা জ্বলিয়া যায়! কাযে অকাযে সকালে বিকালে মাসিকপত্র কার্য্যালয়ের সম্মুখ দিয়া অকারণ ব্যস্তভাবে চলিয়া যাই—যদি কেহ ডাকে! উঃ কী অহঙ্কার এই মাসিকপত্র সম্পাদকদের। কী অবিনয়! তবু যদি লেখকদের নিকট লেখা ভিক্ষা না করিতে হইত!!

সম্পাদকগণের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কিছুদিন আমার লেখা ছাপা হইল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে আরও দু'একটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বয়স প্রায় চল্লিশ হইলে কি হয়, তখনও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আমার যুবক কবির মতই অদম্য উৎসাহ, অপার উচ্চাশা এবং অমিত অধ্যবসায়! তবু কিছুদিন চাপিয়া চুপিয়া কোনও রকমে দিন কাটাইলাম। পরে, দিন যাওয়া যখন দুর্ঘট হইয়া পড়িল—তখন ছোট কন্যা দুটির বিবাহের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলাম। প্রথম দুইটির বিবাহ পূর্ব্বেই দিয়াছিলাম।

ভগবান যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। ভাগ্যে সেই সময়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম—নহিলে আজ কন্যার বিবাহ আমার মহাদায় হইয়া উঠিত।

(৪)

চারিটি কন্যার বিবাহ ও বার খানি "বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ" প্রচার করিতে আমায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ত্রিশহাজার টাকা বাহির করিতে হইয়াছে। সুতরাং মাসিক সুদের হারও বিলক্ষণ কমিয়া গেল। গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া একদমে খরচ অনেকটা কমাইয়া ফেলিলাম। সুবুদ্ধিটা সময় থাকিতেই হইয়াছিল বলিতে হইবে—নচেৎ এই ত পরিণাম! সম্পত্তির মধ্যে তো ব্যাঙ্কের এই অবশিষ্ট বিশহাজার মাত্র টাকা! বড়-

লোক যে নয়, তার বড়লোক-প্রসিদ্ধি যে কী কষ্টকর, তাহা আমার মত যদি এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকেন, তো তিনিই বুঝিবেন। এটা না হয় আমি কোনও মতে চাপা দিতে পারি, কিন্তু প্রার্থীর দল তাহা বুঝে কৈ? তাহারা পুর্ব্বপুরুষের মুক্তহস্তে দান সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে অসামান্য উদা-হরণ দিয়া বিষম লজ্জায় ফেলে।

কী বিপদেই পড়িয়া গেলাম! না অর্থের দিক হইতে, না বংশের দিক হইতে—কোনও দিকেই কিছুই সুবিধা হইতেছিল না। একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল—আমার ভক্তবৃন্দ। তাহারা সন্ধ্যার পর আমার বৈঠকখানায় আসিয়া, আমার যে কোনও কবিতা বা যে কোন গল্প পড়িয়াই, "অতি চমৎকার, অতি চমৎকার, বাঙ্গালা ভাষায় নূতন—একেবারে প্রথম শ্রেণীর" প্রভৃতি দেশী বিদেশী ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিত এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুর করিয়া সেই সকল লেখা পড়িয়া পরস্পরকে শুনাইত। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে আমার পদধূলি লইয়া ধন্য হইত। প্রথম প্রথম আমার কেমন বাধ-বাধ লজ্জা-লজ্জা ঠেকিত; পরে সেটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। চা, চপ, কাটলেটে প্রতি সন্ধ্যায় আমার দুই তিন টাকা ব্যয়ও হইয়া যাইত। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ও-খরচটা আর কমাইতে পারিলাম না।

ছাপা হয় না, তবু লেখার বিরাম নাই। গল্পে ও কবিতায় খাতার পর খাতা বোঝাই হইয়া উঠিল। আমার এমন সুন্দর রচনাগুলি যখন ঘরে পচিতে লাগিল, তখন আমার প্রধান বন্ধু হিতৈষী ও ভক্ত সুকবি যদুনাথ সান্যালের প্ররোচনায়, কাগজ বাহির করিতে সংকল্প করিলাম।

নিজেও বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম যে স্বয়ং সম্পাদক হইলে নিজের

লেখা ত ইচ্ছামত ছাপা যাইবে—আর কিছু হউক বা না হউক! ভক্তগণ অভয় দিলেন যে তাঁহারা নিজেরা তো নিয়মিত লিখিবেনই, পরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নিকট হইতেও লেখা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। গ্রাহক করিবার জন্যও তাঁহারা দলে দলে দেশ বিদেশে বাহির হইবেন।

সম্পাদক হইয়া, কত লেখকের কত শত মিনতিপূর্ণ পত্র পাইব, কত লেখা, কত কবিতা, কত গল্প আমার হস্তগত হইবে—আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সবই ছাপিতে পারি, না করিলে, কোনটাই না ছাপিয়া সবই ফেরৎ দিতে পারি, কিম্বা ছিঁড়িয়াও ফেলিতে পারি—সমস্তই আমার ইচ্ছাধীন। নিন্দুকগণের কোনও লেখা আসিলে তৎক্ষণাৎ কটু মন্তব্যের সহিত ফেরৎ দিব। যাকে খুসী ছাপার অক্ষরে গালি দিব অথবা প্রশংসা করিব। শত শত লেখক আমার পরিচয়-প্রার্থনায় আমার আফিসে আসিবে—একটু হাসিয়া কথা বলিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়া—তাহাই আবার পাঁচজনের নিকট গল্প করিবে! কত লোক কত লেখা ছাপিবার জন্য সুপারিস্ করিবে। পথে ঘাটে কত লোকে আমায় "অমুক কাগজের সম্পাদক" বলিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধুকে চুপি চুপি দেখাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার অলক্ষ্যে আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে। লোকে বলিবে কবি ও গল্পলেখক নবীনবাবু এখন অমুক কাগজের এডিটর।

সুতরাং কাগজ বাহির করাই স্থির হইল।

ছাপাইব কোথা ? পরের প্রেসে ? ছি। যদু বলিয়াছে, নিজে যদি একটা প্রেস কিনি তো সেই প্রেসে কাগজও ছাপা হইবে, এবং বাহিরের কায করিয়া দুপয়সা রোজগারও হইবে। কারণ, ছাপাখানার আজকাল

যত কদর, এত আর কোন পদার্থেরই নয়। ম্যানচেষ্টারের ধুতি অপেক্ষাও প্রেসের চলতি বেশী। যাহারা বাঙ্গালী-সাহেব, ধুতি পরিতে লজ্জিত হন, তাঁহারাও কিন্তু আজ কাল বাংলা লিখিতে বাংলায় বই ছাপাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

মাধব ভরসা দিয়াছে—কাযের যদি অভাব হয় তো পাঁচ বৎসর বিবাহের "প্রীতি-উপহার" ছাপিলেই প্রেসের খরচ উঠিয়া যাইবে। আমাদের সব বন্ধ থাকিতে পারে, বিবাহ ত বন্ধ থাকিবে না। আর প্রত্যেক বিবাহেই গড়ে পাঁচখানি করিয়া প্রীতি-উপহার।

সুতরাং প্রেস খরিদ করাই স্থির হইয়া গেল। হিসাবপত্রও হইল। একটি প্রেস দশহাজার ও কাগজের এক বৎসরের খরচ পাঁচহাজার— পনের হাজার টাকার প্রথমেই প্রয়োজন। অধীর উন্মাদনা ও উত্তেজনায় কিছুই ভাবিলাম না—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলাম।

যদু, মাধব. গোপাল, রামকালী, বিশ্বেশ্বর ইহারা স্বেচ্ছায় আমার সহকারিত্ব গ্রহণ করিল। যদু স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে কাগজের ম্যানেজারী গ্রহণ করিয়া আমায় যুগপৎ উৎসাহিত এবং কৃতজ্ঞ করিল।

খুব উৎসাহের সহিত গোড়াপত্তন হইল। যদুর বাড়ীর নিকটেই বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রেস ও কার্য্যালয় বসাইলাম। আমার বসিবার ঘরে সম্পাদকীয় আফিস হইল। মাসিকের নামকরণ হইল "অঞ্জলি"।

সম্মুখে বৈশাখ মাসও পাওয়া গেল, সুতরাং "অঞ্জলি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। মাসিক একশত পৃষ্ঠার উপর, ৩।৪ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠা চিত্র

এবং তদ্ভিন্ন প্রবন্ধ-কলেবরেও মাসে মাসে ২০।২২ খানি ছবি—বার্ষিক মূল্যের হিসাবে একরকম সস্তাই বলিতে হইবে।

"অঞ্জলি"র বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার পর হইতেই গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মাসিকের রসদ আপনা আপনিই আসিয়া জুটিতে লাগিল। কিন্তু গ্রাহক হইবার পত্র কেহই বড লেখে না। ভাবিলাম, এত সহজ ও সম্মানের পথ ছাড়িয়া আমি এতদিন কোন্ মায়ামৃগের সন্ধানে ফিরিতেছিলাম? এতদিন সম্পাদকগণের দ্বারে দ্বারে নির্লজ্জ ভাবে কী ব্যর্থ উমেদারীটাই না করিয়াছি। আহা, এইটা যদি প্রথমেই মাথায় আসিত, তবে প্রতিভার এই দুর্ব্বহ বোঝা বহিয়া কি মাতৃহারা সন্তানের মত এতদিন এর-তার দ্বার ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত? যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না—সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে উপস্থিত কার্য্যেই নিযুক্ত করিলাম।

প্রথম তিন চার মাস তো আমিই "অঞ্জলি"র অর্দ্ধেক ভরাট করিলাম। গল্পে কবিতায় সমালোচনায় আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখিনী হইয়া উঠিল। যদু, গোপাল ও মাধব ইহারা আমার বিপুল ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্।

মাধব মাসে মাসে প্রাপ্ত কাব্য ও গল্প গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিতে লাগিল। যদু প্রতি সংখ্যায় ২।৩টি করিয়া কবিতা দিয়া আমায় অশেষ ঋণপাশে বাঁধিতেছিল। আর গোপাল গল্পে হাত পাকাইতে লাগিল। রামকালী ও বিশ্বেশ্বর সবই লেখে। ইহাদের সকলের লেখাই আমি খুব ভাল করিয়া সংশোধন করিয়া দিতাম।

এক বৎসর হইয়া আসিল। ছাপা কাগজ ছবি ও লেখা সবই প্রথম শ্রেণীর, তবু গ্রাহকের সংখ্যা আশানুরূপ হইল না। মাত্র ৬০০ শত

গ্রাহক! বর্ষ-শেষে যদু হিসাব দেখাইল, আমার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে!

বন্ধুরা বলিলেন, প্রথম বৎসর লোকসান অনিবার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষে গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া খরচ নিশ্চয়ই কুলাইয়া যাইবে, তৃতীয় বর্ষ হইতে লাভ আরম্ভ।

সুতরাং আরও একবৎসর কাগজ চালাইলাম!

দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্রসংখ্যা বাহির হইলে যদুর নিকট হিসাব চাহিলাম, যদু হিসাব দেখাইল। খরচ উঠা দূরের কথা এবারেও পাঁচ হাজার টাকা লোকসান।

একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নগদ টাকা ব্যাঙ্কেও আর বেশী নাই তৃতীয় বৎসরও যদি এমনি হয়?

মাধব, যদু ও গোপালকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম—এরূপ অবস্থায় আগামী বর্ষেও কাগজ চালান উচিত কি না—এবং যদি চালাইতে হয় তো কী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে গ্রাহকও বাড়ে, কাগজও জনপ্রিয় হয়।

পরামর্শ অনেকই হইল, ফলও চিরকাল যাহা হইয়া আসিতেছে তাহাই হইল। মীমাংসা কোন কথারই হইল না। জুয়াখেলার নেশার মত, "যদি এবার জিতি" এই আশায় আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখি বলিয়া কাগজ চালানই স্থির করিলাম। কারণ বাল্যকালে কোন এক কেতাবে পড়িয়াছিলাম—Try Try Try again.

(৫)

প্রাতে উঠিয়া বৈশাখ সংখ্যার জন্য একটি কবিতা লিখিতে বসিয়াছি। বেলা দশটার মধ্যেই কবিতাটি শেষ হইল। যদু কাছে থাকিলে, আজ

সে এটি শুনিয়া নিশ্চয় আমার পদধূলির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত—কারণ কবিতাটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। দুই তিনবার পড়িলাম—পড়িয়া নিজেই মোহিত হইয়া গেলাম। ভক্তের অনুপস্থিতিতে নিজের পদধূলি নিজমস্তকেই দিতে ইচ্ছা হইল।

স্নানাহার সারিয়া, লেডল'র বাড়ী গেলাম পোষাক কিনিতে।

ফিরিবার পথে ট্রামে দেখি কয়েকজন নব্য যুবক বসিয়া সাহিত্য আলোচনা করিতেছে। আমার কাণটা অমনি সেই দিকেই গেল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া তাহাদের সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলাম।

যে কথা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে হইলে হয়ত এমন করিয়া অকপটে বলিতে পারিতাম না, কিম্বা ভদ্রসমাজে তাহার ঠিক উল্টাই বলিতাম, কিন্তু আজ আর সে প্রবৃত্তি নাই। সত্য কথাই বলিব, কারণ, বঙ্গসাহিত্যে অমর হওয়ার আশা সম্প্রতি আমি নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়াছি!

তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে আজকাল শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "জননী" "সুধা" ও "চন্দ্রাতপ।" আর শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়াও আট দশ জনের নাম করিল। সে ফর্দ্দের মধ্যে না "অঞ্জলি"র নাম, না আমার নাম!

রাগে অভিমানে হতাশায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল দুর্ব্বৃত্তদের গাড়ী হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিই, অথবা গলা টিপিয়া ইহাদের ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ করিয়া দিই। কিন্তু আবার ভাবিলাম, এরূপ করিলে বঙ্গসাহিত্যে তো দূরের কথা, বঙ্গদেশেও আমার জীবনের দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম।

অবশেষে একজন বলিল, "ওহে আবার দেখেচ? নবীন ভটচাযি্য 'অঞ্জলি' বলে একখানা কাগজ বের করেচে।"

অপর ব্যক্তি বলিল—"নবীন ভট্‌চাযি্য আবার কে?"

"আরে, তুমি নবীন ভট্‌চাযি্যকে চেন না? সে যে একজন গিনিয়াস্‌ —গিনিয়াস্‌।"

অপর একজন সজোরে হাঁটুতে এক চাপড় মারিয়া বলিল'—"ওঃ হোঃ জানি. জানি। সে কুটুম্ব যে আমাদের জন্মাবার বহুপূর্ব্বে থেকে লিখচে হে! ট্র্যাশে এত বড় রাইটার আমি এ পর্য্যন্ত আর একটিও দেখিনি! গিনিয়াসই বটে! রাবিশে তাহার অতুল প্রতিভা—প্রতিভাশালা বল্‌লেও হয়।"

দুইজনে তো প্রাণ ভরিয়া হাসিলই, আমার মত আরও যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও দন্তপংক্তি এই বন্ধু-যুগলের অট্টহাস্যের সঙ্গে যুগপৎ বিকশিত হইতে দেখা গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"অঞ্জলির প্রোপ্রাইটার কে হে টুনু? 'গিনিয়াস্‌ মশায়ই না কি?"

টুনু নামক যুবা বলিল—"নামে—ঐ গিনিয়াসই বটে, কাযে কিন্তু যোদো সান্নেল।"

"সে কি রকম?"

"গিনিয়াস মশায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে লোকসান দেন, আর যোদো সান্নেল সে টাকা নিয়ে গিয়ে নিজের বাক্স ভর্ত্তি করে।"

একজন প্রশ্ন করিল, "কোন যোদো সান্নেল? যে যোদো সান্নেল কবি?"

"আরে হাঁ—হাঁ, যোদো কবি। সেই ত কাগজেরও ম্যানেজার, প্রেসেরও ম্যানেজার!"

একজন বলিল, "যোদো এই নবীন ভট্চাযির মস্ত এক ভক্ত, না?"

প্রথমোক্ত যুবক হাসিয়া বলিল—"হাঁ হাঁ। শুধু ভক্ত? অতি-ভক্ত, অতি-ভক্ত—"

"কি রকম, কি রকম?"

এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে ট্রামের বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। শাপে বর হইল।

হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইল বলিয়া এদিক ওদিক একবার চাহিয়া টুনু বলিতে লাগিল—"যোদো ভারি ঝানু ছেলে! সে বুঝি বিনা মৎলবে অমনি ভক্ত হয়ে পড়ল, ভাবচ? সেই ত আমার কাছে সব গল্প করে। তার উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমটায় কিছু হাত-করা। তা হলো না, কারণ, নবীন বড় কঠিন ঠাঁই। শেষে ভূজুং-ভাজং দিয়ে ঐ কাগজ বের করালে, প্রেস কেনালে। প্রেস আর কাগজ থেকে দুবছরে সে প্রায় হাজার চার পাঁচ টাকা মেরেচে। যদি এক টাকায় কিছু একটা কিনে আনে ত খাতায় লিখে রাখে দেড় টাকা। যোদো বাড়ী ফেঁদেছে, প্রায় শেষও হয়ে এল। তৃতীয় বছরের অঞ্জলির 'লাভ' থেকে সে বাড়ীটা কম্প্লীট করবে বলেছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "ছি ছি; এটা কিন্তু যোদোর ভারি অন্যায়। মুখের সামনে প্রশংসা করে'—অসাক্ষাতে তার সর্ব্বনাশের চিন্তা করা কী ভয়ানক অপরাধ বল' দেখি? এবার যোদোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব—"

টুনু বাধা দিয়া বলিল—"কোনও ফল হবে না, বন্ধু, কোনও ফল হবে না! চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আমিই কি তাকে বলতে কিছু কসুর করেছি? সে কি বলে জান? সে বলে বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ শাস্ত্রবাক্য!"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। গাড়ী কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। যুবকেরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া দেখি, বৈশাখ সংখ্যার এক গাদা প্রুফ রহিয়াছে। সেগুলো সজোরে ছিঁড়িয়া, জানালা গলাইয়া বাগানে ফেলিয়া দিলাম।

দারোয়ানকে ডাকিয়া হুকুম দিলাম—"যতুবাবু আনেসে ফাটক বন্দ!"

হিসাবের বহিগুলি আনাইয়া, দুই তিন দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। বিস্তর গলদ। চেক দিয়াছি, তাহা জমা করা নাই। এক খরচ দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে!

কাগজ বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রেস বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম।

একটি সুন্দরী ও ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া আবার সংসারী হইলাম। সম্প্রতি একটি পুত্রও হইয়াছে।

ভিক্ষুক

পশ্চিমের বহুজনাকীর্ণ ধূলিমলিন শহর। সদর রাস্তার সমস্তটা গাড়ী-জুড়ি ধনি-মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া একটি পাশে একটা বৃদ্ধ তেঁতুল গাছের তলায় অন্ধ হোসেনি প্রত্যহ ভিক্ষায় বসিত। সে এইখানটিতে আজ অনেক দিন হইতে বসিতেছে। গায়ে একটা শতছিদ্র চাপ্‌কান, মাথায় একটা অত্যন্ত ময়লা পাগড়ী, পরণে একটা ছেঁড়া পায়জামা। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত—সব সময়েই হোসেনি এইখানটিতে দৈন্যম্লান কুণ্ঠাভরা অটল মৌনতায় বসিয়া থাকিত। পাগড়ীর দুল্যমান্ অংশটি দিয়া প্রখর রৌদ্রে যেমন সে কপালের ঘাম মুছিত, দারুণ শীতেও তেম্‌নি এই টুকু দিয়াই সে কাণ ঢাকিয়া শীতের আক্রমণকে ব্যর্থ করিত।

তার চাপ্‌কানের সম্মুখ দিকের ঝুলটা দুই হাতে পাতিয়া হোসেনি চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিত। যাহার যাহা খুসী হইত' সে সেই আঁচলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। তার দক্ষিণে বামে, অদূরে, আরও অনেক দরিদ্র নরনারীরা আসিয়া বসিত; সন্ধ্যা হইলে—লোক-চলাচল কমিয়া আসিলে—তাহারা উঠিয়া যাইত। হোসেনি বসিয়াই থাকিত। অদূরে কাছারীর পেটা ঘড়িতে ছয়টা বাজিলে, সে সান্ধ্য নমাজ পড়িয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বৃক্ষমূলে সরিয়া যাইত, রাত্রে একটা উঁচু শিকড়ে মাথা রাখিয়া সেই তরুতলেই ঘুমাইত।

হোসেনি মুখ ফুটিয়া কিছু কহিত না; তার আশে পাশে সকলে

চীৎকার করিত, পথিককে সেলাম করিত, দুঃখ-ব্যথা জানাইত, পেট চাপড়াইত, খঞ্জ পদ, বিকৃত হস্ত দেখাইত, কত-কি করিত—কিছু না পাইলে গালি দিত, পাইলে একটু আশীর্ব্বাদ করিত ; কিন্তু হোসেনি দাতাকেও আশীর্ব্বাদ করিত না, অ-দাতাকেও কটুবাক্য বলিত না। তবে কখনও কখনও সে আপনার মনে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিত—"দিয়া—লিয়া—বখত্ পর্ কাম আবেগা!" কিম্বা যদি কখনও দাতাকে কিছু বলিত, তো বলিত—"খোদা তেরা দমকো আবাদ রাখ্‌খে।"

এই রাস্তাতেই দিনের মধ্যে বেশী লোক চলে—কারণ এই দিকে আদালত। এই জন্য ভিক্ষুকও এ পথে অপেক্ষাকৃত বেশী। যারা বসিত সকলেই কিছু না কিছু পাইত, কিন্তু হোসেনির নীরব দৈন্য খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

স্কুলের ও পথের ছেলেরা কত সময় তার আঁচলে ইঁট মাটি ধূলা ফেলিয়া দিয়া আমোদ করিয়াছে, বিস্কুট বলিয়া ঘুটে দিয়াছে,—হোসেনি যেমন হাতে করিয়া টিপিত অমনি ছেলেরা এক সঙ্গে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত। হোসেনি সেগুলি ফেলিয়া দিয়া, আঁচলটি সাফ করিয়া পূর্ব্বের মতই বসিত—কখনও বিরক্ত হইত না। কত দিন তাহার আঁচল হইতে পয়সা উঠাইয়া লইয়া কত দুষ্ট ছেলে পলাইয়াছে, হোসেনি যেন জানিয়াও জানে নাই এমনি ভাব করিয়া বসিয়া থাকিত। কেহ বলিয়া দিলেও হোসেনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হইত না।

সম্মুখেই, অর্থাৎ পথের অপর ফুটপাথে, হায়দারের রুটির দোকান্। হায়দার প্রত্যহ হোসেনিকে এক খানি করিয়া রুটি দিত—হায়দারের ভৃত্য একটা এনামেলের গ্লাসে করিয়া খানিকটা জল দিয়া যাইত।

সে তাই খাইয়াই জীবনরক্ষা করিত। কখন-কখনও হোসেনি তাহার সঙ্গীদিগকে বলিত—"আর কত দিন? পঞ্চাশ বছর তো পার হ'লো—আর কত দিন?" হোসেনি জানিত, হায়দার তাহার আহার যোগায় কিন্তু একদিনও মুখের কথায় পর্য্যন্ত সে তাহার কৃতজ্ঞতা জানায় নাই।

ভিক্ষুকেরা মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করে। কিছু দিন অন্তর এক পথের লোক অন্য পথে যায়, অন্য পথের লোকেরা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। কত দল গেল, কত দল আসিল। কত কত কণ্ঠের কাকুতি-মিনতি, হুঙ্কার-চিৎকার কত কত পথিকের কর্ণ ভারাতুর করিল—হোসেনি কিন্তু এই একই জায়গায় একই রকমে কাটাইয়া দিতেছিল। কখন-কখন এক আধজন লোক বলাবলি করিতে করিতে চলিয়া যাইত—"এ লোকটা বরাবর এই খানেই বসে, কখনও কিন্তু একটু নড়চড় দেখলাম না, বা গলার একটা আওয়াজও শুন্‌লাম না!"

হায়দার বলে, "বছর খানেক আগে একে আমি কখনও দেখি নাই।" রহিম দপ্তরিও হোসেনির খুব তারিফ করে। রহিমের বাড়ী হায়দারের বাড়ীরই লাগালাগি।

*

পৌষ মাস। প্রচণ্ড শীত। খবরের কাগজে প্রকাশ, এবারকার শীতের মত শীত বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই। বিলাতেও নাকি তাই এবার খুব 'সুখের খ্রীষ্টমাস' হইয়াছে।

সকাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বাতাসও যেন দীর্ঘ বিরহের অবসানে বৃষ্টিধারার সহিত মিলিত হইয়া ঘন ঘন নিবিড় আলিঙ্গনপাশে

শিহরিয়া উঠিতেছিল। হোসেনি তাহার বক্র দেহ-যষ্টিখানিকে আজ তেঁতুলতলের অতিনিকটে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। চিরদিনের বিস্তৃত আঁচলখানি আজ তার জানু আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। পাগ্‌ড়ী চাপ্‌কান এবং পায়জামা সবই জলে ভিজিয়া গিয়াছে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষকাণ্ডের পানে আরও সরিয়া বসিল।

সন্ধ্যা ছয়টা। এরই মধ্যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইতে লাগিল। অন্ধকার আপনার বিরাট সত্তায় চারিদিক ছাইয়া ফেলিল! পথে লোক নাই, গাড়ী নাই, আলো নাই। কেবল অন্ধকার! পর্দ্দায় পর্দ্দায় স্তরে স্তরে মাটি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। পথিপার্শ্বে তিন্তিড়ীতলে অন্ধ হোসেনি এবং তাহার পাশে একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্তা গৃহহারা ভিখারিণী।

ভিখারিণীটি আজ কয়েক দিন হইতে এই খানে বসিতেছে। শীতে ও বৃষ্টিতে সেও গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া আসিয়াছে। রাস্তার কুকুরগুলি লোকের বারান্দায় উঠিয়া শয়ন করিয়াছে। বাদলে বাতাসে কেবল মাতালের মত হা হা করিয়া অট্টহাস্যে ছুটাছুটি করিতেছিল!

ক্রমশ ক্লান্ত নিদ্রাতুর পবন থামিয়া গেল—টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় রুদ্ধ বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। বৃক্ষপত্রে বৃষ্টিধারা এবং বৃক্ষনীড়ে সুপ্ত পাখীর আর্দ্রপক্ষধূননরবে মৃত্যু-রজনীর তমিস্র যবনিকাখানি মুহুর্মুহু আন্দোলিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। রাজপথে গৃহগবাক্ষ দিয়া বিকীরিত আলোক-জ্যোতিও জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। যে আলোকরশ্মি এতক্ষণ জনহীন বহির্জগতকে এক সূক্ষ্ম সূত্রে গৃহস্থের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়াছিল—সে যোজকসূত্রটিও ক্রমশ ছিঁড়িয়া গেল। ইট-পাথরের

শক্ত দেওয়ালগুলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীষণতর দৈত্যের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

হোসেনি সমুজ্জ্বল দিবালোকেও যেমন দেখিত, এখনও তেমনি দেখিতেছিল—কেবল শীতে তাহাকে অত্যন্ত কাবু করিয়া ফেলিল। সে বুকের উপর হাঁটু দু'টি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভিজিতেছিল। বৃক্ষকাণ্ডের অপর পার্শ্বস্থিত ভিক্ষুক-রমণী যখন দেখিল, তাহার নয়ন-পথের শেষ বাতিটিও নিবিয়া গেল, তখন সে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হতভাগিনী এখনও কামনা করিতেছিল—হয় ত কোনও হৃদয়বানের নীরব চরণপাতে সে সাহায্যসান্ত্বনায় পুলকিত হইয়া উঠিবে, হয়ত কোনও দাতা গোপন দানের জন্য আসিয়া তাহাকে একটু খাদ্য আর এক টুকরা গরম কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে—তাই সে বিলম্বে ছটফট করিতেছিল; অসহ্য যন্ত্রণাকে ধৈর্য্যের হাত ধরাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু বিশ্বজগতের সহিত সকল সম্বন্ধের একটি সকরুণ অবশেষের মত এই দীপরশ্মিটিও যখন অন্তর্হিত হইল—তখন সূচীভেদ্য অন্ধকারে একটা দম্‌কা হাওয়ার মত তাহার শেষ আশাটুকু বক্ষপঞ্জরগুলিকে সজোর আঘাতে আলোড়িত করিয়া দিল। কহিল—"ওঃ—বাবা—" হোসেনি শুনিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

রমণী ডাকিল—"মিয়া সাহেব!—"

হোসেনি উত্তর দিল—"কি মা?"

শীতে এবং ক্ষুধায় রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কুষ্ঠরোগিণী ভিখারিণী থামিয়া থামিয়া,

দমিয়া দমিয়া বলিল—"বাবা, আরতো আমি বাঁচি না! আমাকে বাঁচাও; রমণী বসিয়া থাকিতে থাকিতে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল।

হোসেনি ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল,—"ভয় কি মা? এই যে, আমি এই খানেই আছি।" রমণী কোনও উত্তর করিল না। হোসেনি উত্তর প্রতীক্ষায় কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল—কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাইল না। বসিয়া বসিয়াই আস্তে আস্তে হোসেনি রমণীর নিকট সরিয়া আসিল; হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া হোসেনি দেখিল সে কাদার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে।

হোসেনি ডাকিল—"ওঠো—মা—ওঠো, এখানে কি শোয়?—এ যে কাদা? আবার বলিল; আবার বলিল—সাড়া নাই! অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল—"ওগো, এমন জলের উপর শুলে কেন"?—নিরুত্তর। নাড়া চাড়া দিয়া ডাকিল—"ওগো, কথা কইচ না কেন? বলি—" রমণী এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল, সংজ্ঞালাভ করিয়াই ক্ষীণতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি আজ তিন দিন কিছু খাই নাই, বাবা; কেউ আমাকে একবারটি জিজ্ঞাসাও করে নাই! আর আমি থাকৃতে যে পারছি না!" রমণী কাঁদিতে লাগিল।

সেদিন হোসেনির হায়দারের দেওয়া রুটির একটু খানি ছিল; সে পাগড়ির একটা খুঁটে সেটুকু বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—মনে পড়িল। দৃষ্টিহীন হোসেনি রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া শীতজর্জ্জরিত ভূলুণ্ঠিত ভিখারিণীর মুখে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিল। রুটিটুকু আগে হইতেই জলে ভিজিয়া নরম হইয়াছিল বলিয়া, তাহার খাইতেও কোন কষ্ট হইল না। কাপড় নিংড়াইয়া তাহার মুখে জল দিয়া

হোসেনি যখন এই হতভাগিনীকে মৃত্যুর মুখ হইতে ছিনাইয়া লইল, তখন তাহার আবার এক নূতন উপসর্গ জুটিল। শীতের কাঁপুনি এবং যন্ত্রণা নারীকে দ্বিগুণ জোরে চাপিয়া ধরিল। ক্ষুন্নিবৃত্তি বলিয়া এতক্ষণ যাহারা উদাসীন ছিল—এখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিল, কারণ ক্ষুধা হারিয়া গিয়াছে।

ভিখারিণী বলিল—"মিয়া সাহেব, তুমি আমার বাপ! আজ আমার জান্ বাঁচালে।"

শীতে রোগ-দুর্ব্বল দেহের ক্ষীণ রক্তস্রোতটি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল!—কথাও রুদ্ধপ্রায় তবুও বুকে হাঁটু দুইটি চাপিয়া রমণী উঠিয়া বসিল। হোসেনি বুঝিল, আপনার জায়গাটিতে সরিয়া আসিল।

আকাশে একটা বিদ্যুৎ হানিল। বৃষ্টিধারাগুলি একবার চকিতে পুষ্পবৃষ্টির মত ফুটিয়া উঠিয়া আবার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। ঘনগম্ভীর মেঘস্বননে জমাটবাঁধা অন্ধকারের উপর আর একটা চাপ পড়িল। তীরের মত একটা বাতাসও সেই সময়ে রাস্তার এপার হইতে আসিয়া নর্দ্দামা ডিঙ্গাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে ওপার দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রমণী শীতকম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল—"বাবা, শীতে ম'লুম! আর বাঁচি না!" হোসেনি নীরবে মাথার পাগড়ীটি তাহার আবরণের জন্য দিল। স্ত্রীলোকটি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অঙ্গুলি ছিল না—তাহার গায়ে জড়াইয়া দিতে বলিল, হোসেনি নীরবে পালন করিল। তবু ও তার কাঁপুনি থামে না! তাহার উপর ক্ষতস্থানসমূহ দিয়া রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছে!

রমণী "বাপরে, মারে" করিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

হোসেনি পাগড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে চাপকান পায়জামাটি পর্য্যন্ত দিয়া ভিখারিণীকে আবৃত করিয়া দিল—কিন্তু তবুও তাহার না থামে কম্পন, না থামে যন্ত্রণা! আর সে কি করিবে? স্থানও নাই, ছাতাও নাই! জলপড়া আটকায় কিসে? বহু পূর্ব্বেই তো হোসেনি তার নিজের জায়গাটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। এবার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সামান্য একটু কৌপীন্ মাত্র পরিয়া, হোসেনি মুক্ত আকাশের তলে আপনাকে ছাড়িয়া দিল!—হোসেনির শুশ্রূষায় স্ত্রীলোকটি ক্রমশঃ একটু একটু সুস্থ হইতে লাগিল বটে, হোসেনি কিন্তু জলে ভিজিতে লাগিল। জল বাতাস ও শীতের সহিত সে নগ্নদেহে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

* * * * * *

প্রভাতে আকাশ নির্ম্মেঘ! প্রাতঃসূর্য্য কিরণমালায় জলঝরা তৃণপত্রে মুক্তামালা দোলাইয়া দিয়া দিগন্তব্যাপিনী এক অপূর্ব্ব শান্তশ্রী ছড়াইয়া দিয়াছে। পথপার্শ্বের পয়ঃ-প্রণালীতে কল-কল ছল-ছল করিয়া কর্দ্দমাক্ত জলরাশি ছুটিয়া চলিয়াছে! পথে এখনও স্থানে স্থানে জল জমিয়া সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। অদূরে দুই একটি কুকুর সদ্যোনিদ্রোত্থিত হইয়া রাস্তায় যেখানে রৌদ্র পড়িয়াছে, সেই থানে সম্মুখ ও পশ্চাতের পায়ের জোড়া দুইটিকে কিঞ্চিদধিক ফাঁক করিয়া কটি অবনমিত করিয়া হাঁই তুলিতেছে। একটি দুইটি করিয়া দোকান পাট সব খুলিতে লাগিল। গতরাত্রের সেই পথে আবার সুখ-দুঃখের ব্যস্ত কোলাহল জাগিয়া উঠিল!

হায়দার দোকান খুলিল। প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী একখানি রুটি লইয়া তেঁতুলতায় আসিয়া দেখে, প্রতিদিনের মত হোসেনি তাহার নিজের

জায়গাটিতে আজ আর বসিয়া নাই—বরং তাহার খানিকটা দূরে, ফাঁকা আকাশের নীচে একটু কৌপীনমাত্র পরিয়া কাদার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। হোসেনির স্থানটিতে তাহারই কাপড়চোপড়ে আবৃত সেই কুষ্ঠরোগিণী ভিখারিণী পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার বিকৃত মুখমণ্ডলে সূর্য্যালোক পড়িয়া মুখখানিকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

হায়দার মুসলমানী কায়দায় সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া হোসেনিকে ডাকিল! হোসেনি নিরুত্তর—গাঢ় সুপ্ত! হায়দার তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল—সে দেহ বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, পাথরের চেয়েও শক্ত!

গৌরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌরীর কপাল পুড়িল।

সতীশের মা সতীশকে ধরিয়া বসিলেন—বাবা, তুই তবে আর একটা বিয়ে কর, সতু। বৌমার আর ছেলে টেলে কিছু হবে না, ও বাঁজাই হলো।

পুত্রকে নীরব দেখিয়া, মা ভাবিলেন পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহে ইচ্ছা নাই; তাই অনুরোধটাকে একটু জোরালো করিবার জন্য অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে গাঢ়স্বরে কহিলেন—এমন কপালও করে-ছিলাম যে এই পঞ্চাশ বছর বয়স হতে গেল, কোনও সুখ হলো না? অদেষ্টে মারি হাড়ির ঝাঁটা। অমন তিন তিনটে সোনার চাঁদ ছেলে যমের পেটে দিলাম যে। তা নৈলে আর আমার ভাবনা কিসের?—

এ প্রস্তাবে সতীশ পুলকিত হইল কি দুঃখিত হইল, তাহা সে নিজেই ভালো বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার মধ্যে কথাগুলি সব বোঁ বোঁ করিয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মা কিছুক্ষণ থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন—কপালগুণে গোপাল মেলে! তা নৈলে গাঁযে ত' এত লোকই রয়েচে—কার আর এমন ছেলের বাঁজা বৌ?

সতীশ কহিল—আচ্ছা, মা, এ বিষয়ে ভেবে দেখব! এখন বড়

তাড়াতাড়ি, একবার বেরুচ্ছি; দাঁড়াতে পারব না। বলিয়া সতীশ চালের বাতা হইতে চটি জোড়াটি পাড়িয়া, দুই হাতে দুই পাটির তলায় তলায় বার দুই সজোরে ঠুকিয়া ধুলা ঝাড়িয়া, ঠেলিয়া পায়ে পরিয়া পট্ পট্ করিতে করিতে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন—ঠিক যা ভেবেচি।

গৌরী সন্ধ্যা দিতে শাশুড়ীর ঘরে ঢুকিয়াছিল। মাটির প্রদীপটি হাতে করিয়া সে সব শুনিল। হঠাৎ অতর্কিত দীর্ঘ নিশ্বাসের দম্‌কা হাওয়ায় করধৃত দীপটি নিভিয়া গেল! সম্মুখদিকের চালে একটা টিক্‌টিকি "টক্ টক্ টক্ টক্" করিয়া ডাকিয়া উঠিল। গৌরী সে অবসন্ন অবস্থাতেও অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা ভূমিতে তিনটি টোকা মারিয়া, তর্জ্জনীটি কপালে ঠেকাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিগত কয়েক মাস হইতেই সতীশের মা এইরূপ একটা কল্পনা করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম বধূর অপ্রত্যক্ষ্যেই গ্রামের বর্ষীয়সীদের সঙ্গে পরামর্শ চলিত; পরে গৌরী যখন সব শুনিয়াই ফেলিল—তখন হইতে আর এ আড়াল আব্‌ডাল রহিল না।

গৌরী নীরবে শুনিত—শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িত, কিন্তু কী করিবে? উপায় নাই। তাহাকে এমন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে যাহার উপর মানুষের কোনও ক্ষমতা চলে না—অথচ, সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, তাহার জীবনের সমস্ত

সুখ একেবারে বিধ্বস্ত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পুত্রবতী হইতে গৌরী কত ব্রত করিল, ঠাকুরঘরে, ষষ্ঠীতলায় কত প্রার্থনা জানাইল, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কাছে কায়মনোবাক্যে কত মানৎ করিল, সাধু সন্ন্যাসীকে হাত দেখাইল, মাতুলী কবচ ও দেবতার পুষ্প ঝুলাইয়া কণ্ঠে বাহুতে এবং কটিতে অলঙ্কারের পর্য্যন্ত স্থানাভাব ঘটাইল, কিন্তু সব বিফল হইল! তাহার দূর সম্পর্কীয়া এক পিতৃষ্বসা জগন্নাথ-দর্শনে পুরী গিয়াছিলেন; তিনিও গৌরীর জন্য অক্ষয়বটতলে আঁচল পাতিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আস্তৃত অঞ্চলে কোন ফল পড়ে নাই শুনিয়া সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, গৌরী বন্ধ্যাই। কেবল গৌরীই একা সম্পূর্ণরূপে ভরসা ছাড়ে নাই, অসম্ভব কি সম্ভব হয় না? সে কী করিয়া নিরাশ হয়? শুধু তো তাহার এ দুর্ভাগ্য একা আসিবে না—এর সঙ্গে সঙ্গে যে তার সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই সে এত দিন কোন রকমে আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ সে তাহার সর্ব্বনাশকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিল। বন্ধ্যত্বের সহিত তাহার স্বামীর উপর অধিকারটুকু পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইতে বসিয়াছে। গৌরীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। একটা বিরাট দৈত্য অদৃশ্যে তাহার বক্ষোমঞ্চের উপর তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। দিন দিন তাহার সদাপ্রসন্ন হাস্যপুলকিত শ্যামোজ্জ্বল মুখশ্রী ম্লান হইতে লাগিল।

গৌরীর দেহবর্ণ শ্যাম বলিয়া সতীশ তাহাকে ইদানীং অপছন্দ করিত; নিরক্ষর বলিয়া যখন তখন অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের বিদুষী স্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে অন্ত্যজ জাতীয়া রমণীদের সহিত একাসন দিত; এবং স্বামীর সহিত প্রেমালাপের রীতি-পদ্ধতি জানে না বলিয়া কটুকাটব্য পর্য্যন্ত করিত—কিন্তু গৌরী তাহাতে একদিনের জন্যও দুঃখিত বা অপমানিত

বিবেচনা করে নাই, বরং আপনার হীনতায় এবং পরম দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না বলিয়া, নিজেই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত।

এরূপ অপদার্থ একটা স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে পাইয়া সতীশ সর্ব্বদাই আপনাকে হতভাগ্য ভাবিত,—এবং তাহার জীবনের যে সব সুখই এই কুরূপা গৌরীই নষ্ট করিয়া দিয়াছে—এ কথা সতীশ খুব জোরের সহিতই গৌরীকে পুনঃ পুনঃ শুনাইত। গৌরী তাহা শুনিয়া নীরবে কাঁদিত আর গলায় কাপড় দিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিত—হে ঠাকুর, আমার এমন স্বামী। তোমার পায়ে ধরি, যাতে তাঁকে সুখী কর্‌তে পারি সে ক্ষমতা আমায় দাও। দেবতা সে কথা শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু নিয়তি তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিল।

স্বামী কি শ্বাশুড়ী কাহারও কথার প্রতিবাদ সে কখনও করে নাই; কারণ তাহার বিশ্বাস যে তাহাতে পাপ হয়। সতীশ কল্পিত দোষারোপ করিয়া অন্যায়ভাবে ভৎর্সনা করিয়াছে, গৌরী নীরবে শুনিয়াছে; শেষে সজলনয়নে সে দোষের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছে। তবু কখনও বলে নাই—যে সে এ কায করে নাই। তাহার ধারণা তাহার কোন গুণ নাই, তবু যে তাহাকে তাহার স্বামী ত্যাগ করেন নাই—ইহাই তাহার যথেষ্ট লাভ ও সুকৃতি। আর নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্মই পতির আজ্ঞাধীনতা। তাই এত বড় একটা কথা শুনিয়াও গৌরী বাহিরে অনেকটা স্থির ধীরই রহিল।

দীঘির ঘাটে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ুয্যে না কি আবার বিয়ে কর্‌বে, গৌরি?

গৌরী সলজ্জভাবে উত্তর দিল—হাঁ, কর্‌বেন।

কেন?

আমার যে ছেলে হলো না ভাই!

গৌরীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সতীশের বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। সতীশের পূর্ব্বে তাহার আরও তিনটি সহোদর জন্মিয়াছিল কিন্তু কেহই বেশী দিন বাঁচে নাই।

সতীশের মা এই পিতৃহীন একমাত্র জীবিত চতুর্থ পুত্রটিকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িয়া সতীশ যখন পাশ হইল—তখন সকলেই সতীশকে চক্‌দীঘির ইংরাজী বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে তাহার মাকে অনুরোধ করিল। গ্রাম হইতে চক্‌দীঘি মাত্র সাত ক্রোশ। কিন্তু মাতৃস্নেহ সন্তানকে চক্ষের আড়ালে রাখিতে স্বীকৃত হইল না বলিয়া সতীশের বিদ্যালাভ গ্রামেই পরিসমাপ্ত হইল। বিশেষতঃ ইংরাজী শিখিলে দূর দেশে চাকরী করিতে যাইতে হয়, মাতাপিতা দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি থাকে না, হিন্দুধর্ম্মবহির্ভূত সর্ব্বপ্রকার অখাদ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মায় ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া জননী আর পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে দিলেন না।

সতীশ গ্রামের একজন ভাল ছেলে। কাজেই জমিদারের সেরেস্তায় অনতিবিলম্বেই তাহার একটা কর্ম্ম হইল।

এই সময়ে বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় আসিয়া সতীশের মাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার মত গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে, ইহাতে মহাপুণ্য, শত শত গো-দানের ফল। মা দেখিলেন যে গাঁয়ে ঘরে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই তো সব চেয়ে ভাল; অথচ উক্ত গো-দানের পুণ্যফল লাভও অনিবার্য্য। ছেলেও চক্ষের আড়ালে যাইবে না, আর বউকেও ডাকিতে হাঁকিতে বিপদে আপদে সব সময়েই

পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া, তিনি সকলের মুখেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাটির অজস্র প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। তবু একদিন গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিয়াই রাজী হইলেন।

গৌরীর রং নবোদিত কিশলয়ের মত শ্যাম—যাহা মাজিলে ঘসিলে পরিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই রক্ত শ্বেত বা পীতবর্ণে পরিণত হইয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় না। নাকটি বাঁশির মত, চোখ দুটি টানা টানা বড় বড়, সলজ্জশ্রীতে মনোরম; ভুরু দুইটি লম্বা মোটা ও জোড়া; হাত-পা গুলিও খাট' খাট' গোলগাল—গা'টিও বেশ নরম; মাথায় একঝাড় চুলও আছে! খুব শান্ত শিষ্ট এবং ঘরকন্নার কাযে নিপুণ মা একেবারে গলিয়া গেলেন। সপ্তদশবর্ষেই সতীশের গৌরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। গৌরীর বয়স দশ বৎসর। তখন সতীশের বহির্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা এত প্রখর হয় নাই। সে বিবাহ করিয়া আশাতীত রকমের এক গৌরব অনুভব করিল। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলকে সতীশের মনপ্রাণ বিভোর হইয়া গেল।

গৌরী শ্বশুরালয়ে আসিয়াই, রান্নাঘরে শ্বাশুড়ীর প্রবেশনিষেধ ঘোষণা করিয়া দিল। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া বাসি পাট সারিয়া শাশুড়ীর ঘরের দুয়ারে গিয়া বসিয়া থাকিত। শ্বাশুড়ী কত নিষেধ করিয়াছেন, সে তাহা শুনে নাই।

শ্বাশুড়ী বধুর শত শত প্রশংসাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বধুরও তাহাতে কাজ করিবার, সেবা করিবার ইচ্ছা প্রবলতর এবং শক্তিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! শাশুড়ীর অপরিসীম স্নেহচুম্বন ও প্রশংসায় এবং স্বামীর প্রীতিতে গৌরীর নারীত্ব,—মাধুর্য্যে, বিনয়ে

এবং কোমলতায় এক অপূর্ব্ব শ্রীতে দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল।

বাল্যকাল হইতে গৌরী কখনও লেখাপড়া কার্পেটবোনা বা উলতোলা শেখে নাই—দিবারাত্র মধ্যবিত্ত পল্লীগৃহস্থের কন্যা হইয়া সংসারের কাজ-কর্ম্মই শিখিয়াছে বলিয়া—শ্বশুরবাড়ীতেও সে অক্লান্তভাবে গৃহস্থালীর কায সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। মায়ের কাছে শিখিয়াছিল যে, শ্বশুরবাড়ীতে লজ্জা-সরম করিয়া চলিতে হয়—আজ দশ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, তবুও শাশুড়ী বারম্বার খাইতে না বলিলে সে কখনও নিজের ভাত নিজে বাড়িয়া লয় না। এই সঙ্কোচ শাশুড়ীর নিকট এতদিন রমণীয় এবং প্রশংসনীয় বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছিল। তবু গৌরীর কপাল পুড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশের বিবাহের যখন সমস্ত পাকাপাকি আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন একদিন গৌরীর পিতা আসিয়া সতীশের মাকে এ বিষয়ে আরও একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তই হইলেন—আপনার জিদ্ ছাড়িলেন না। গৌরীর অজস্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এমন ঘরণী গৃহিণী বৌ, এমন সাক্ষাৎ লক্ষী বউ ছেড়ে কি সাধে ছেলের বিয়ে দিচ্ছি, ভাই? একটা বংশ তো চাই?

বিষ্ণুপদ বলিলেন—এখনো তো গৌরীর সে সময় উত্তীর্ণ হয় নাই? এর চেয়ে বেশী বয়সেও তো লোকের সন্তান হয়।

সতীশের মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বেয়াই ক্ষেপেছ? এই অঘ্রাণে যে বৌমা কুড়ি পেরোলেন? এর পর কি আর ছেলে হয়? আমার যখন প্রথম ছেলে কোলে হয়, তখন আমার বয়েস চৌদ্দ বছর মোটে।

বলিয়া তিনি বহুকালগত সেই সন্তানের জন্ত কিছু আক্ষেপ করিলেন।

বিষ্ণুপদ বলিলেন—সে সব দিন আজকাল আর নেই, বেয়ান। আজ কাল ২৫।৩০ বছরেও স্ত্রীলোকের সন্তান-সন্তাবনা হয়।

সতীশের মা, ইহা মনভুলানো মিথ্যাকথা, যাহা কেবল হাস্তরস সঞ্চারের জন্তই ব্যবহৃত হইল ভাবিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া, বৈবাহিকের রসিকতার প্রশংসা করিলেন।

গৌরীর মাও বেয়ানকে অনেক অনুনয় অনুযোগ করিলেন, কিন্তু বেয়ান আপনার জিদ্‌ ছাড়িলেন না।

সতীশও ইদানীং গৌরীকে নূতন করিয়া অপছন্দ করিতে লাগিল। কারণ সে পঞ্জিকামধ্যস্থ বিজ্ঞাপনোক্ত প্রায় সমস্ত উপন্তাসগুলিই পড়িয়াছে কিন্তু কোথাও গৌরীর মত বর্ণজ্ঞানবিহীন, অসভ্য কালো মেয়ে কোনও ভদ্র লোকের পত্নী আছে বা ছিল, তাহা পড়ে নাই। কাযেই সে এই সুযোগে একটি মনোমত পত্নী লাভ করিবার ফন্দীতে অতি সহজেই মত দিযা, পাত্রী পছন্দ করার ভার নিজহস্তেই লইল।

সতীশের ইচ্ছা—তাহার ভাবী পত্নী, রূপে বেশভূষায়, হস্তপদসঞ্চালনের অপরূপ ভঙ্গীতে, বিদ্যায, শিল্পকলায়, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে, সীমন্তরচনাব নূতনত্বে, হাবভাবের মৌলিকত্বে "বিদ্যুৎকুমার" উপন্তাসের শৈলবালার সমকক্ষ হইবে।

সম্প্রতি সতীশের উপর জমিদারবাবুদের মামলামোকদ্দমা তদ্বিরের ভার পড়ায়, তাহাকে প্রায়ই মাটীপোতা মহকুমায় যাইতে হইত। সেখানে জমিদারের মোক্তার রামনৃসিংহ রাযের অনূঢ়া ষোড়শবর্ষীয়া পঞ্চমা কন্তাকে

সতীশের মনে লাগিল। "শৈলবালার" বর্ণনার সঙ্গে নাকি রায়মহাশয়ের কন্যা আন্নাকালীর দৈহিক অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সেই স্থানেই সব ঠিক হইল। শুভদিনে শুভকার্য্য সুসম্পন্নও হইয়া গেল।

বিবাহের দেড়মাস পরেই নববসত হইল। বধূ স্বামীর ঘরে আসিয়া কায়েমী হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল—আন্নার কেবল রংটা একটু কটা' বলিয়াই বিকাইয়াছে, নচেৎ তাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এতই কুরূপ এবং কুৎসিত যে এই কটা চামড়াখানি না থাকিলে তাহাকে চিরজীবন কুমারী হইয়াই থাকিতে হইত।

এ সমস্ত মন্তব্য সতীশেরও কিছু কিছু কর্ণগোচর যে না হইয়াছিল, তাহা নহে—তবে সে সে-কথায় বিন্দুমাত্রও টলে নাই। বরং সতীশ যতদূর সম্ভব আন্নাকালীকে শৈলবালা ভাবিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টিত হইল।

আন্নাকালী স্বামীর ঈদৃশ স্ত্রীভক্তিতে প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ অনুভব করিত, কিন্তু স্বামীর নিয়ত উপদেশে এবং পতিনির্ব্বাচিত বহু সদ্‌গ্রন্থ পাঠে ক্রমশ তাহার সে সমস্ত "কিন্তু ভাব" অন্তর্হিত হইল। তবে সে যে সহরে মেয়ে, তাহার পিতা পয়সাওয়ালা মোক্তার—এ অভিমান তাহার বরাবরই ছিল। এই জন্য গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে নির্ব্বিচারে সে তাহার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে হীন এবং অসভ্য ঠাওরাইয়া, মনে মনে ঘৃণা করিত!

এরূপ ভাবান্তরের মোটামুটি কয়েকটি কারণও ছিল। ইহারা যে কখনও থিয়েটার দেখে নাই, ঘোড়ার গাড়ীতে পর্য্যন্ত চড়ে নাই, মেল্-

সাহেবে ঘোড়ায় চড়ে', মাঠে বল্ খেলে তাহাও দেখে নাই, হাওয়াগাড়ী চড়া দূরে থাক্ চক্ষে দেখিয়াও মানবজন্ম সার্থক করে নাই, ইহাই তাহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। এই সুযোগে প্রথম প্রথম আন্না, তাহাদের নিকট অনেক সম্ভব অসম্ভব অলৌকিক অসাধারণ বিষয়ের গল্প করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কোন বিষয়ে সন্দিহান বা প্রতিকূলে প্রশ্ন করিলেই সে চটিয়া গিয়া তাহাকে অপমান করিত।

পল্লীগ্রামের তথাকথিত অসভ্য রমণী হইলেও বিদ্যা না থাকুক, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাহাদের যথেষ্টই ছিল—কাযেই তাহারা গল্পের সে মোহও আত্মসম্মান রক্ষার্থে ত্যাগ করিল। এক .এক করিয়া প্রায় সকলেই আন্নার সঙ্গ ছাড়িল। আন্না একাকিনী থাকে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরী সতীন, সুতরাং তাহাকে তো আন্না প্রথম হইতেই দূরে রাখিয়াছিল। গৌরী আন্নাকে প্রশংসমান্ সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিত, আর ভাবিত সে কী সৌভাগ্যবতী। আহা, ওর মত যদি গৌরীর কপাল হইত!

গৌরীর ইচ্ছা খুবই যে, আন্নার সঙ্গে কথা কয় আলাপ করে, তার কাছে দুদণ্ড বসে—কিন্তু সে বিদ্বান্, সহুরে, স্বামীর মনোমত—তার কাছ ঘেঁসিতেও সে সাহস করিল না। সে ভাত রাঁধে, পাট করে, সকলকে খাওয়ায়, শাশুড়ীর সেবা করে আর গৃহবিতাড়িত ক্ষুধিত কুকুরের মত সতীশের পানে দীননয়নে চায়।

আন্না একাই বা কি করিয়া কর্ম্মহীন জীবন সারাদিন ধরিয়া বহন

করে? যাহার করিবার কায অনেক, অথচ তাহাতে যদি অবহেলা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অকায করিবার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। স্বামীর অত্যধিক আদর পাইয়া, তাহার আদর করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত—সে কেবল খোঁচা মারিতেই শিখিল। সে বুঝিয়াছিল, তাহার কায ন্যায় হউক অন্যায় হউক কেহই তাহাতে বাধা দিবে না সুতরাং ক্রমশঃ তাহার ন্যায়ান্যায় জ্ঞান যেমন তিরোহিত হইতেছিল, যথেচ্ছাচারের মাত্রাও তেমনি বাড়িয়া চলিল।

নিজে সে কোন কাযই করিত না, অথচ গৌরী সাধ্যমত প্রাণপণ চেষ্টায় দাসীর মত তাহার আজ্ঞাপালন করে—সে ঐকান্তিক সেবাতেও আন্না ক্রটি ধরিয়া গৌরীকে ভৎ‌র্সনা করিত। শাশুড়ীর কৃত কোন কার্য্যই তাহার মনোমত হয় না—তজ্জন্য তিনি পুত্রবধূর নিকট অল্প বিস্তর কথা শুনিয়া, পুত্রের মারফৎও শুনিতে লাগিলেন।

আন্না ভাবিয়াছিল, এইরূপ করিলে তাহার নাগরিকতা, সভ্যতা এবং বঙ্কিমমুখী যেমন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আদরের মাত্রাও তেমনি বাড়িতে থাকিবে।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর গেল, অথচ একবেলার জন্যও গৌরী যে পিত্রালয় যায় না—যাহার গ্রামে পিত্রালয়—আন্না তারই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কেবল তাহাই নহে, সে যে এই সারাদিন একটা সামান্য দাসীর মত পাট করে, পাচিকার মত দুই বেলা পাক করে আর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত যাহা বলা যায় তাহাই প্রতিপালন করে—তাহারই বা কারণ কি? সে যে নিতান্ত নাতোয়ান—অন্নাভাবে এই দাসীপণা এবং স্থানাভাবে এখানে অবস্থান করিতেছে—তাহাও তো

বোধ হয় না। তবু যে কোনও রমণী সপত্নীর এরূপ আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে—ইহার নিশ্চিত কোনো নিগূঢ় কারণ আছে! আন্না জানে সে এ অবস্থায় একবেলাও থাকিতে পারিত না, বা কখনও পারে না। কাযেই আন্না কারণ-নিরূপণে ব্যস্ত হইল।

কয়েক দিন পরে ঠিক করিল যে—সতীশ এখনও তাহাকে ভালবাসে। আন্নার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। হিংসায়, দ্বেষে তাহ'র নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল! আন্না শুইয়া পড়িল। রাত্রে অশ্রুগম্ভীর বদনে আন্না কহিল—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

সতীশ যেন স্বর্গচ্যুত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

আন্না মান-সংহত স্বরে কহিল—কেন কিসের? আমি বাড়ী যাই—তুমি ওকে নিয়েই থাক'।

সতীশ বিস্মিত হইয়া সুধাইল—কা'কে? কা'কে নিয়ে থাক্‌বো?

—তোমার বউকে নিয়ে। ওকে যদি ছাড়্‌তেই না পারবে, তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

—কী যে বকচ তুমি, আমি তার কিছুই বুঝতে পার্‌চি না!

—বলি, বিকেল বেলা রান্নাঘরের ছাঁচ্‌তলায় ওর সঙ্গে কী ফুস্‌ফুস্‌ কর্‌ছিলে? মনে কর', আমি কিছু দেখতে পাই না, নয়? আমি কি, একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত যে, কিছু বুঝি না?

সতীশ আশ্বস্ত হইয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বলিল—এই কথা?

—হাঁ, এই কথা!—বলিয়া আন্না সতীশকে ভেঙচাইল।

সতীশ একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—সোজাসুজি কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌লেই তো আমি বল্‌তাম। তুমি সে দিন হাঁসের ডিম ভাজা খেতে

চেয়েছিলে, তাই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ও রান্না করবে কি না? এখানে আমাদিগকে ও সব লুকিয়ে খেতে হয় কিনা? নৈলে সমাজে পতিত করে। এতো আর সহর দেশ নয়?

বলিয়া সতীশ আবার হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিল।

আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বললে? রাঁধবে?

—হাঁ, তা' রাঁধবে।

—আচ্ছা, ও ওর বাপের বাড়ীই যাক্ না! তুমি কেবল বল—ও গেলে কাযকর্ম্ম কে করবে? তা না হয় আমি আর মা দুজনে মিলে কায করব, না পারি শেষ পর্য্যন্ত একটা ঝি রেখে দিলেই চলবে। আমি তোমায় বলি শোন'—আমি পষ্ট কথা বলি। আমরা দুই সতীন। ও-ও আমায় দেখতে পারে না—আমারও যে ওকে খুব ভাল লাগে, তা-ও নয়। পরে কোন্ দিন ঝগড়াঝাঁটি হবে—তখন তুমি আমায় দুষবে। ওর হয়ে না হয় ওর বাপ মা আসবে—আমার তো এখানে বাপ মা নেই? কায কি, পাঁচজন লোক হাঁসিয়ে?

সতীশ আন্নাকালীর বিচক্ষণতায় চমৎকৃত হইল। বলিল—কথাটা তুমি খুব ভালই বলেছ। কিন্তু ও যেমন কায কর্ম্ম করে, তোমার তো তা' অভ্যাস নেই—তুমি কি সেই রকম পারবে? আর মাও বুড়ো মানুষ। বোঝ'। সেই জন্যেই বলি—ও থাক্। ঝি রাখতে বলচ'—তাকে মাসে মাসে যে টাকাটা দেব'—শালিয়ানা হিসেব কর'—তোমার তাতে একটা জিনিষ হতে পারবে! তুমিই ভেবে দেখ'—তাড়াতে বল' আমি কালই তাড়িয়ে দিচ্ছি।

আন্না বলিল—না, সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। তুমি ওকে পাঠিয়েই

দাও। কায তো ঢেঁকি। দুটি আর তিনটি মাত্র তো লোক—এ আমরাই করে' কর্ম্মে' দেব।

সতীশ প্রীত হইয়া বলিল—বেশ। সে ব্যবস্থা আমি কালই কর্‌চি। এর জন্যে আর ভাবনা কিসের?

রাত্রি প্রভাতেই সতীশ মাকে বলিল—মা, এদের দু'জনকে দুটাই করে দেওয়া দরকার। নৈলে কোন্ দিন ফৌজদারী লাঠালাটি কর্‌বে? তখন পাঁচজনে দাঁড়িয়ে হাঁস্‌বে। এখন দু'চার কথায়, ঠুক্‌ঠাক্ হচ্ছে—বাড়তে আর দেরী নাই। বিষ্ণু মুখুয্যেমশায় তো নতুন বৌয়ের নিন্দের আর বাকী রাখেন নাই। তিনি বলে বেড়ান—নতুন বৌ নাকি ওকে ধ'রে মারে। কায কি? সতীন—

মা পুত্রের এই সুসম্বদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথার শেষ হইতে না হইতেই বলি-লেন—বাবা, তুমি তো দেখ নাই আমার এক পিবেশ ছিলেন, তাঁর এক সতীন ছিল, সে যে কুলুক্ষেত্তর হতো সারাদিন—বাবা!

সতীশ বলিল—সে যাই হোক্ গে—এখন ওকে ওদের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও; নৈলে নতুন বৌ থাক্‌বে না বল্‌চে।

স্থির হইল, গৌরীকেই পাঠাইয়া দিতে হইবে। নতুন বৌ গেলে চলিবে না। গৌরী গেলে সতীশের সুখশান্তি হয়—সুতরাং মা দ্বিরুক্তি করিলেন না, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৌরী চলিয়া গেলে প্রথম প্রথম কয়েকদিন আন্নাকালী সংসার-কার্য্যে খুব উৎসাহের সহিত মনোনিবেশ করিল। শ্বাশুড়ীকে বাড়ীঘর পাট করা বাসনমাজা জল তোলা প্রভৃতি লঘুকর্ম্ম দিয়া, আপনি রন্ধন পরিবেশন আদি গুরুতর শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যগুলি বাছিয়া লইল।

গৌরী থাকিতে এতকাল আন্নার যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, ঠিক মত সে যেন নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেছিল না। গৌরী কখনও আন্নার কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই বা তাহার কৃত কার্য্যে ঘৃণাক্ষরেও অসন্তোষ প্রকাশ হইতে দেয় নাই—তবুও গৌরীর ক্ষীণ হাস্যরেখালীন প্রসন্ন অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিলেই আন্নার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ আসিয়া জুটিত এবং সেই মূকপ্রায় অনলস কর্ম্মিণীর প্রতি একটা অকারণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ইঙ্গিতে আন্নার সকল ঔদ্ধত্য মাঝ পথে বাধাপ্রাপ্ত হইত। কাযেই গৌরীকে বিদায় দিয়া আন্না নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এ সুখও বেশী দিন রহিল না। মাসখানেকের মধ্যেই সতীশ, তাহার মাতা এবং আন্না তিন জনেই বুঝিতে পারিল যে গৌরী গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেকখানি সুখও সে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

অনভ্যাসের ছলনায় আন্না ক্রমশঃ রান্না খারাপ করিতে লাগিল—যাহাতে তাহার হাত হইতে এ ভারও খসিয়া যায়। খসিল না। এবার আন্না শিরঃপীড়ার ভাণ করিল—তখন আর গত্যন্তর নাই! জননী রান্নার ভারও গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, বধু ভাল হইলেই আবার তাহার হাতে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু এ ব্যারাম শীঘ্র আরোগ্য হইবার নাম

করিল না। প্রত্যহ সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা মাথার এত যন্ত্রণা হয় যে আন্না আর কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না, চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারে না—সময় সময় নাকি অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিও শুনা যায়। দ্বিপ্রহরে রাত্রে শরীরটা কতক ভাল থাকিত সেই সময়ে সে যৎসামান্য লঘু কার্য্য কিছু করিত। সতীশ তাহাও করিতে বারণ করিল। তাহার আশঙ্কা, যে দুর্ব্বল শরীর কোন সময় পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়া না প্রাণ হারায়। আন্না শুনিত না, তবু কোঁতাইতে কোঁতাইতে এক হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া, দুই একবার বসিয়া উঠান ঝাঁট দিত বা বাসন মাজিতে বসিত—সতীশ দেখিয়াই অমনি পত্নীর উপর মহা অনুযোগ জুড়িয়া দিত।

মাতাপুত্রে আন্নাকে হারাণ কবিরাজের ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কত সাধিল, কিন্তু আন্না তাহাতে রাজি হইল না, বলিল,—মেয়ে মানুষের কত অসুখ হয়, তার জন্যে কি আর ডাক্তার কবরেজ ডাকতে হয়? ইত্যাদি। স্বামী ও শাশুড়ী বধূকে ইহাতে কতই না প্রশংসা করিলেন।

সে যাহাই হউক্, আন্নার অসুখও যেমন সারিল না, শাশুড়ীর হাত হইতে সংসারও তেমনি নামিল না।

কেবল যে সংসারের কাযই মার উপর পড়িয়াছিল, তাহা নহে। এই খাটুনীর উপর আবার পুত্রবধূর আজ্ঞাধীনতা ছিল। যদি ঠিক কথামত বা সময়মত কোনও কার্য্য না হইত তবে তাঁহাকে তার জন্য শত শত কৈফিয়ৎ দিতে আর অনেক বাক্যবাণও সহ্য করিতে হইত। রোগীর পথ্য, সুতরাং বেলা ১০টা ১১টার মধ্যে হওয়াই চাই—ওদিকে রাত্রি ৮টা। সতীশের মার প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইতে গেল—চিরকালই এইরূপ রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইয়া খাওয়াইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে—

এখনও তিনি বিশেষ পটু কিন্তু এই সময়ের বাঁধাবাঁধিতেই তিনি যেন বিশেষ অস্থির হইয়া পড়িলেন! সময়ের সঙ্গে যে নাওয়া খাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে—এটা এতদিন তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি জানিতেন রান্না হইলেই খাওয়ার সময়। কিন্তু একি? এ যে রান্না না হইলেও তাড়া দেয়; আবার কখনও রাঁধিয়াও এক প্রহরকাল বসিয়া থাকা। এটা তাঁহার কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল।

গৌরী যখন ছিল--তখন এ সব তাঁহাকে এক দিনের জন্যও ভাবিতে হয় নাই! সে যে হাতের কায কাড়িয়া লইয়া করিত। একা সে বিগত বার বৎসর কাল এই কায করিয়া গিয়াছে। তাহাকে পুনরায় আনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু একদিন যাহাকে শত আয়োজনে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, আজ তাহাকে কি প্রয়োজনে ফিরাইয়া আনা হয়? দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে আজ বহু দূরে।

এত আদরের পুত্র সতু—যার জন্য এত উপচার, এত ব্যাকুলতা, এত যন্ত্রণা—সেও আজ একবার দুঃখিনী মায়ের পানে ফিরিয়া তাকায় না! অসুখ হইলে একবার জিজ্ঞাসা করে না—মা কেমন আছ? দশমীর দিন সুধায় না—মাগো জলখাবার কি আছে? দ্বাদশীর দিনও একবার খোঁজ করে না, যে হতভাগিনী বাঁচিয়া আছে কি না? বরং বৌয়ের হইয়া অন্যায় অকারণ ভর্ৎসনাই করে। বৌ সে তো পরের মেয়ে—নিজের পেটের ছেলেই যখন শুধায় না, তখন আর কী?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর এই সবে পাঁচ বৎসর সতীশ আন্নাকে লইয়া সংসার করিতেছে। ইহার মধ্যেই আন্নার ভিতরে সতীশ তাহার সেই আদর্শ নায়িকাকে আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। যে মোহে এক দিন আন্নাকে সতীশ কল্পলোকের অসামান্যা মানবী ভাবিয়া তাহার চরণে সমস্ত প্রীতিপুষ্প নিঃশেষে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে—সে মোহ এখন টুটিয়া গিয়াছে। এই পাঁচবৎসরের পূজার ফুল যেন এক বীভৎস মাযাবিনী রাক্ষসীর পদতলে তাহার স্বকৃত-আত্মাবমাননার কলঙ্ক-শৈলের মত পুঞ্জীভূত হইয়া, সতীশকে নিষ্ঠুর পরিহাসে বিদ্ধ করিতে লাগিল। অল্পবুদ্ধি সতীশ আগুন লইয়া খেলা করিবার সময় অপরকে দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন ভাবে নাই যে একদিন এই বর্দ্ধিষ্ণু বহ্নিশিখা তাহাকেও আহুতি চাহিবে। আজ সে দিন আসিয়াছে—সতীশের হুঁস হইয়াছে।

আন্নার স্বভাবই ছিল নিষ্ঠুর এবং অহঙ্কারী। কেহই যখন আর তাহার নিকটে রহিল না তখন সে সকল কথাতেই সতীশকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কোনও একটা কিছু হইলেই সতীশকে—পাড়াগেঁয়ে ভূত অথবা ঐরূপ একটা কিছু বলিয়া বসিত। সকলকে অবমানিত এবং ঘৃণা করিয়া আন্নার স্বভাবই এমন উগ্র ও উষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, অনেক সময় সে নিজেই বুঝিতে পারিত না কাহাকে কি বলিতেছে বা এ কথার ফল কি দাড়াইবে। যদি সতীশ বুঝাইতে যাইত যে এ কথা গুরুজনকে বলিতে নাই ইত্যাদি—তাহাতে আন্না দ্বিগুণ জিদ্ ধরিত ও অন্যায় রকমে তর্ক, যুক্তি ও নজির প্রদর্শন করিয়া আপনার কথাই বহাল

রাখিত। ভুল দেখাইয়া দিলে, আন্না তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক ভুলকে ভুল বলিয়া মানিতেও রাজি হইত না—সুতরাং তাহার এ ব্যাধিও হইল দুরারোগ্য।

সতীশ যতই অল্পবুদ্ধি হউক, এবং আন্নাকে যতই উপন্যাসের নায়িকার মত ভক্তি করুক—স্বামী হইয়া সদা সর্ব্বদা প্রত্যেক কথাতেই এরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অপমান আর সহ্য করিতে পারিল না। বহুকাল উপেক্ষা করিয়া দেখিল—কোনো ফলই যখন ফলিল না—তখন একদিন সে-ও নিজমূর্ত্তি ধরিল। সেই দিন হইতে তাহাদের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ চলিতে সুরু হইল।

গত রাত্রি হইতে সতীশের মার প্রবল জ্বর। সকাল পর্য্যন্ত তাঁর সংজ্ঞা নাই। সতীশ কাছারী যাইবার আগে আন্নাকালীকে বলিল—মার তো ভয়ানক জ্বর! তাঁর জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। এ বেলা তুমি রাঁধ'গে আর মাকে মধ্যে মধ্যে দেখো। আমিও শীগগির আস্‌চি।

আন্না শিরযন্ত্রণার আতিশয্য ভাণ করিয়া ক্ষীণ আনুনাসিক স্বরে উত্তর দিল—একে আমি মর্‌চি নিজের রোগের জ্বালায়, তার উপর আবার রেঁধো, রোগীর সেবা করো, রোগীকে দেখো—

সতীশ বাধা দিয়া উষ্ণ ভাবে বলিল—ও-সব চালাকী তো অনেক হয়েছে, আর কেন? যদি না রাঁধ তো খাবে কী? আমি না হয় রাধাবল্লভের প্রসাদ খেয়ে আস্‌বো। আর ঐ যে আমার মা, এই পাঁচ বৎসর কাল তোমার সেবা কর্‌লেন, তুমি তাঁর একদিন একটু জ্বর হলে দেখবে না? বল্‌তে লজ্জা হয় না? বদ্‌মাইস্ পাজী কোথাকার—বলিতে বলিতে সতীশ উগ্র হইয়া উঠিল।

আন্না তর্জ্জনী তুলিয়া, দাঁড়াইয়া সতীশকে রোষ-স্তম্ভিত স্বরে কহিল—দেখ' মুখ সামলে কথা কয়ো! গাল মন্দ দিলে ভাল হবে না কিন্তু, আমি আগে থেকে তা' বলে রাখচি।

সতীশ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিল—খবর্দার, হাজার বার গাল দেব; খুব করব। আবার চোখ্ রাঙানো হচ্ছে? পাজী—বদ্মাইস্।

আন্না শয্যায় শুইয়া—ও বাবা গো, বাবা আমায় কোথা দিয়েছ গো, দেখে যাও গো, ইত্যাদি আবেদন করিতে করিতে রোদন সুরু করিয়া দিল।

সতীশের রোষ-কষায়িত রক্তচক্ষু জ্বলিতে লাগিল। গর্জ্জন করিয়া উঠিল—চুপ্ কর্, বদ্মাইস্! এই সকাল বেলায় উঠে মরাকান্না জোড়া হচ্ছে।

আন্না থামিল না দেখিয়া সতীশ মুখ ভেংচাইয়া বলিল—বাবা,… বাবা,…বাবা তো খোঁজ খবর করে' কিছু রাখে না! কখনও তু'পয়সার একখানা পোষ্টকার্ড লিখে পর্য্যন্ত খোঁজ করে না! আবার—ফের কান্না?…এখনও চুপ্ কর্ বল্চি, নৈলে চাবকে পিঠের চাম্ড়া তুলে দেব!…দেখবো তোর কোন্ বাবা এসে রক্ষা করে?…

বলিতে বলিতে সতীশ সক্রোধে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সারাদিন সতীশ আর বাড়ী আসিল না। বৈকালে ফিরিয়া, মার ঘরে গিয়া দেখিল তখনও তাঁহার জ্বর ছাড়ে নাই—তেমনি জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই পড়িয়া আছেন। আন্নাও কোন খোঁজ খবর লয় নাই। আন্নার এ হৃদয়হীন ব্যবহার সতীশকে আজ মাতালের মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তারপর অমনি হন্ হন্ করিয়া একেবারে গৌরীর পিত্রালয়ে আসিয়া হাজির। একদিন যাহাকে বিনাপরাধে দুর্ব্বহ কলঙ্কের বোঝা মাথায় দিয়া স্বাধিকার হইতে বিদায় দিয়াছিল, আজ বড় দুর্দ্দিনে প্রথম যৌবনের চিত্তাধিকারিণী সেই দরদী দয়িতার নিকট অতি-বড় অপরাধীর মত সতীশ আসিয়া ধরা দিল।

গৌরীরা এ সব ঘটনা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল—কাযেই তাহারা তত বিস্মিত হইল না। কিন্তু গৌরী সতীশকে আবার আপনার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে পাইয়া আচম্বিত পুলকে, অযাচিত সৌভাগ্যে এবং অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল; সে পড়িতে পড়িতে বসিয়া পড়িল। স্বামীকে দেখিয়া, পিতা মাতার সমক্ষে অবগুণ্ঠন টানিতেও গৌরী ভুলিয়া গেল।

শ্বশুর শ্বাশুড়ী অপরাধী জামাতাকে আপনার দুর্গ মধ্যে পাইয়া প্রথমটা তো খুবই অভিমানের অভিনয় করিলেন। সতীশ পদলুণ্ঠিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল—তাঁহারা গলিয়া জল হইয়া গেলেন।

সতীশ গৌরীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে—শ্বশুর মহাশয়

বক্রহাসির ও টেপাচোখের রঙ করা দুই একটি শ্লেষের কুঙ্কুমও জামাতার দিকে সেই সুযোগে ছুড়িয়া লইলেন।

সতীশের অধোবদন আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

কোথাও নবচুতমুকুলের গন্ধে ভরা, কোথাও সজিনা-ফুলের সুবাস ছড়ানো সান্ধ্য পল্লীপথে গৌরী আবার পতির অনুগমন করিল। আকাশে চাঁদ ছিল। চরণতলে শুষ্ক পত্র মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল। একেলা পথের তরুবীথিতে মাঝে মাঝে চকিত-পাখীর কাকলিতে স্তব্ধ সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ পথ ঝঙ্কারিয়া গুঞ্জরিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

গৌরী একেবারে বরাবর শ্বাশুড়ীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কক্ষ অন্ধকার। সতীশ বড় ঘরের চালের বাতা হইতে স্বল্পাবশিষ্ট একটুকরা মোমবাতি পাড়িয়া আনিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিল। গৌরী পতিগৃহে আবার দীপ জ্বালিল!

সতীশের মা চক্ষু মেলিয়া সেই অস্পষ্ট দীপালোকে গৌরীকে দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন—ব-উ-মা-আ-। চক্ষু লাল, দৃষ্টি প্রসন্ন এবংআশীর্ম্ময়ী। কণ্ঠস্বর অতর্কিত, জড়িত, শুষ্ক কিন্তু তাহা আত্মগ্লানি অনুতাপ ও লজ্জায় সকরুণ এবং মধুর। শিশুর ডাকের মত সরল এবং আশ্বাস পূর্ণ।

সতীশ জননীর কক্ষ হইতে যেমন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি নবীন বেহারা আসিয়া প্রাঙ্গনে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—দা ঠাকুর গো, কা'ল সকালে তো যাওয়া হচে' না! কাল কুনু বেহারাই যে'তে রাজি' নয়। পোরশু নিচ্চয় হবে।

সতীশ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে কি রে কালই যে দরকার ছিল।

নবীন ধান্যেশ্বরীর প্রসাদে তখন বিশেষ প্রফুল্লই, বলিল, এজ্ঞে দা' ঠাকুর তা বল্লে তো হচে' না। এ অপ্‌রাধ মাপ্ কর্‌তেই হবে। আমি তোমায় ঠিক্ বলে যেচি. পোওশু বদি কেরুকে না পাই—তা'লে আপনি নিশ্চয় জেনো বৌঠাক্‌রুণকে আমি একাই মাথায় করে পৌচে দেবেন। বলিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

আন্না জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সব শুনিল!

তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সতীশের মা সেই অল্পালোকে হারাণো জিনিষ ফিরিয়া পাওয়ার মত গৌরীকে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। গৌরীর মুখে চোখে দেহে হাত বুলাইয়া তাহার বর্ণের মলিনতা, শরীরের কৃশতা, লাবণ্যের হ্রাস আবিষ্কার করিতে করিতে স্নেহের চুম্বনে অজস্র আশীর্ব্বচনে এবং অকপট শুভকামনায় গৌরীকে একবারে মূঢ় করিয়া দিলেন। গৌরীর স্থির নির্ম্মল চিত্ততট আজ এই আশাতীত সৌভাগ্যে ও গৌরবে আন্দোলিত ও অভিভূত হইয়া অশ্রুধারায় গলিয়া ফলিয়া উছলিয়া উপচিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা চারিদণ্ড হইতে না হইতেই বহুদিনের অপরিষ্কৃত, স্থানে স্থানে জমা-করা আবর্জ্জনাগুলি মুক্ত করিয়া, আঙ্গিনাটি সুপরিষ্কৃত করিয়া, স্নানাদি সারিয়া, গৌরী পাকশালায় প্রবেশ করিল।

আন্না সকাল হইতে কয়েকবার এ-ঘর ও ঘর ঘুরিয়া, কোনও একটি বাক্স খুলিয়া, কোনটি সজোরে বন্ধ করিয়া, কোনও বাক্সের উপরে একখানি পুরাণো পাঁজি বা একখানি কম্বলের আসন ছিল, সে গুলিকে

টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, খুব ব্যস্তভাবে আপনার ঘরে আসিয়া দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার অপ্রসন্ন রোষগম্ভীর প্রলয়-মেঘের মত স্তম্ভিত মুখশ্রী, স্ফীত-আরক্ত নেত্র, স্রস্ত অবিন্যস্ত তাম্রাভ চুল কতক চুঁট হইয়া ও কতক দাঁড়াইয়া উড়িয়া মুখে পড়িয়া মাথাটাকে খুব যেমন বড় দেখাইতেছিল, তেমনি তাহাকেও একটা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর মত করিয়া তুলিয়াছিল।

কাল হইতে সতীশের স্নানাহার হয় নাই বলিয়া গৌরী যথাসম্ভব শীঘ্র রন্ধনাদি সারিয়া সতীশকে খাওয়াইয়া শ্বাশুড়ীকে লঘু পথ্য দিয়া, আন্নাকে ডাকিতে গেল। অনেক ডাকিল কোনও উত্তর পাইল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল—সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সতীশ ও তাহার মা দেখিতেছিল। সতীশ তর্জ্জন করিয়া বলিল—যে না খায়, না খাবে!...সাধাসাধি কিসের...চলে' এস...ফের দাঁড়িয়ে থাকে?...

গৌরী অনিচ্ছিত মন্থরচরণে ফিরিল। সতীশ রৌদ্রে পিঠ দিয়া তামাক খাইতে লাগিল। মা দন্ত কড়মড় করিতে করিতে অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—বাপরে বাপ্।...কি পাহাড়ে বজ্জাৎ...এই পাঁচ বছরে আমার হাড় মাস ভাজাভাজা করলে?...সাত জন্ম ছেলের বিয়ে না হোক এমন বৌয়ে কায নেই... আ ছি ছি!

গৌরী ভাতে জল দিয়া রাখিয়া হেঁসেল তুলিল। আন্না অভুক্তই রহিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষ। শ্রীপঞ্চমী। আমবাগানের অস্পষ্ট কুহেলি ভেদ করিয়া জমিদারের বাড়ী হইতে নহবতের শানাইয়ের ললিত-বিভাস রাগিণী সুপ্ত পল্লীর রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল। দুর্ব্বাদলের মৌক্তিকমালা গড়াইয়া পড়িতেছিল। বৃক্ষশাখাপ্রচ্যুত শিশিরবিন্দুগুলি শুভদিনের পুলকাশ্রুর মত টপ টপ্ করিয়া ঝরিতেছিল। বেহারা চারিজন ডুলিটি বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া ডাকিল—দা' ঠাকুর, দা' ঠাকুর গো!

সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গৌরী শ্বাশুড়ীর পদপ্রান্তে নিদ্রিত ছিল—সে একবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—নবনে এসেছে বুঝি?

সতীশ কোঁচার টেপ মুড়ি দিয়া দুয়ার খুলিতে খুলিতে বলিল—হা মা তারাই এয়েচে।

বেহারারা উঠানে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতে লাগিল।

আন্নার ঘরের দুয়ার ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। সতীশ হঠাৎ একটা তীব্র-বিকট গন্ধে চমকিয়া উঠিল। দুই পাটি দুয়ার বিস্তারিত করিয়া খুলিয়াই অস্পষ্ট আলোকে সতীশ দেখিল—আন্না তাহার সমস্ত দেহে কেরোসিন্ নিষিক্ত কাপড় জড়াইয়া পুড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই কম্পিত অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে "উ—উ—উ—উ" করিয়া সতীশ ধড়াস করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

সতীশের গোঙানি শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মা, গৌরী এবং বেহারারাও ছুটিয়া আসিল। আন্নাকালীর দগ্ধ মৃতদেহ দেখিয়া বেহারারা

সরিয়া পড়িল। মা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন ; গৌরীও থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘামিতে লাগিল। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিবেশীদের আগমনে গৃহাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দাশরথি মুখোপাধ্যায় গ্রামের একজন মাতব্বর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সকলকে চুপ করিতে বলিয়া ও-ঘরের দুয়ার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। কারণ দারোগা না আসা পর্য্যন্ত লাশের কোন প্রকার সৎকার করা উচিত নহে—তাহাতে 'ফলং বন্ধনং,' এই মহাতথ্যটি তিনি পঞ্জিকান্তর্গত সংক্রান্তি-পুরুষের ন্যায় নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন।

থানা এবং দারোগার নাম শুনিয়াই লোকে কাঁপিতে লাগিল। কাহাকে থানায় পাঠান যায় এবং সে ব্যক্তি উক্ত স্থানে গিয়া কি বলিবে এই বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা হইতেছে এমন সময়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, ৪।৫ জন খোট্টা কনেষ্টবল এবং গ্রামের দুইজন চৌকীদারসহ স্বয়ং দারোগাবাবু সশরীরে আসিয়া হাজির।

অপ্রত্যাশিতভাবে দারোগাকে দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, সবাই ঘন ঘন ঢোক গিলিতে লাগিল।

কাংলা চৌকিদার দেখাইয়া দিল—হুজুর এই সতীশ বাঁড়ুয্যে।

সতীশের মাথা ঘুরিতেছিল। তাহার মুখমধ্যে কে যেন এক মুষ্টি ছাতু ঢুকাইয়া দিয়াছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সতীশ নির্ণিমেষ নেত্রে দারোগাবাবুর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার গা দিয়া দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। সে যে জাগ্রত এবং এ সব যে সত্য—এ কথা সে ধারণাই করিতে পারিতেছিল না।

দারোগা হুকুম দিল—বাঁধো। রামলগন তেওয়ারী হাতে যখন হাত-

কড়ি পরাইল, তখন সতীশ—দোহাই দারোগাবাবু, আমি কিছুই জানি না হুজুর—বলিয়া শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তেওয়ারীজী বাধা দিয়া হল্লা করিতে নিষেধ করিলেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মা কোথায় ?

সতীশের জিহ্বা ও তালু মরুবালুকার মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে রুদ্ধরোদনে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে ঐ ঘরে। দারোগাবাবু হীরাসিংকে উল্লিখিত ঘরে পাহারা দিতে আদেশ করিলেন।

ও ঘরে আর কে আছে।

—আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। আর কেউ নাই বোধ হয়।

দারোগাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রথম পক্ষের স্ত্রী ? আন্নাকালী দেবী তবে তোমার কে ?

আজ্ঞে, সে আমার দ্বিতীয় পক্ষ।

সতীশের ভয় এবং মুখুয্যে মশায় প্রভৃতি প্রতিবেশী কয়েকজনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

দারোগাবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—লাশ কোন্ ঘরে ?

কাংলা চোকিদার একলম্ফে দরজার নিকটবর্ত্তী হইয়া ঘর দেখাইয়া বলিল—এজ্ঞে এই ঘরে, মা বাপ !

দোর খোল্।

কাংলা দুয়ার খুলিল। দারোগাবাবু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সিপাহীরা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বাহির হইতে দেখিয়াই মুখের খৈনী ফেলিয়া দিল।

দারোগাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সতীশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ এবং স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খাশ দারোগেয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—আন্নাকালীকে কে মেরেছে ?

সতীশ ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল—ওতো হুজুর দেখ্‌চেন আত্ম-হত্যা করেছে। কেরোসিন তেলে—

দারোগাবাবু এক ধমক্ দিয়া কহিলেন—মিথ্যা কথা ছাড়’। ঠিক ঠিক বল’।

সতীশের কণ্ঠ ঘর্‌ঘর্ করিয়া উঠিল, চক্ষু নিস্প্রভ, নিশ্বাস দ্রুত। সে বলিল—হুজুর, যথা ধর্ম্ম আমি বল্‌চি। এই ভোর বেলায় বেহারারা এলে. তাদের সাম্‌নেই আমি দোর ঠেলে দেখি এই !

—মিথ্যা কথা ! তোমরা একে খুন করেছ।

সতীশ বসিয়া পড়িল ! হঠাৎ তাহার মাথা এমন ঘুরিয়া উঠিল যে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

কক্ষান্তরে তাহার জননী ও গৌরী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মুখুয্যে মশায়রা ভাবিতেছিলেন—কি মুস্কিলেই তাঁহারা পড়িলেন। তাঁহারা পলাইতে পারিলে বাচেন কিন্তু উঠেন কি করিয়া ? উঠিতে গেলেই যদি “এই যাও কোথা” বলিয়া চাপিয়া ধরে ? পুলিশ যে—ওরা কি বুঝিবে যে আমরা নির্দ্দোষ প্রতিবেশী !

দশম পরিচ্ছেদ

সতীশের মুখে জলের ছিটা দিতে বলিয়া, দারোগাবাবু প্রবীণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কহিলেন—মেয়েদিকে আপনি একটু চুপ করতে বলুন্। এখন আর বৃথা কাঁদাকাটা করে' ফল কি ?

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার মাজা-কোমর চড়্ চড়্ করিতেছিল—একটু নড়িয়া বাঁচিলেন। মেয়েদের কান্না থামিল না, তবে স্বরটা কিছু নীচু হইল।

তখনও সতীশের জ্ঞানোদয় হয় নাই, দারোগাবাবু মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত ভীত ও বিমূঢ় দেখিয়া, তাঁহাকে কহিলেন—আপনাদের ভয় কি ? আপনি কাঁপ্‌চেন কেন ? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁপুনি যেন আরও বাড়িল, তিনি প্রাণপণ শক্তিতে একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা মুখব্যাদানেই পর্য্যবসিত হইল। কহিলেন —"হেঁ হেঁ, সে আপনার দয়া, আপনার দয়া।" বলিয়া সজল নয়নে হাতে হাতে সজোরে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দারোগাবাবু তখন তাঁহাকে সতীশ, সতীশের মাতা, আন্নাকালী ও গৌরীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মত যতদূর সম্ভব সতর্ক হইয়াই উত্তর দিতে সুরু করিলেন ; কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিলেন যে, এ দারোগাবাবু এখনও পাকা দারোগা পদবাচ্য হন নাই।

ইহার বয়স ২৬।২৭; অল্পদিন হইল রাঁচী হইতে পাশ করিয়া

বাহির হইয়াছেন—লোকটি খুবই বিনয়ী এবং ভদ্র। তাহাতে সকলেরই যেমন অনেকটা ভয়-ভাঙার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, তেমনি ভক্তিরও একটু ভাটা দেখা গেল। কারণ, পাকা দারোগা হইলে তাহার মুখে হাসি, ভদ্র সম্বোধন এবং আলাপে শিষ্টতা থাকিবে কেন?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রাণী চারিটি সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা যথাযথ সবই বলিলেন। দারোগাবাবু তাহাতে যেন কেমন চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ—এইরূপ ভাব ধারণ করিলেন—একটু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তা'হলে আপনার বিশ্বাস কি, এঁরা একে হত্যা করেন নাই?

মুখো। না হুজুর, ও আত্মহত্যাই করেছে। আমি তো বল্লাম যে যে এ মেয়েটা ছিল পাড়াকুঁদুলী। এ পাড়ায়—এ পাড়ায় কেন এ গাঁয়েই—কোনও ঝি বউ. এমন কি তার সমবয়সীরা পর্য্যন্ত এর ঝগড়া ও বদ্‌মেজাজের জন্য কাছে পর্য্যন্ত আসতো না। মিছেমিছি তাদিকে অপমান কর্‌তো। বেশী কথা কি, ইদানীং সে তার স্বামী শ্বাশুড়ীকে পর্য্যন্ত অপমান করতো। প্রায়ই শুনতাম ঝগড়া ঝাঁটি। এ সব আস্পর্দ্ধা ঐ গরুটাই (সতীশকে লক্ষ্য করিয়া) তো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সতীশের মা বুড়ো মাগী, সে নির্ব্বিচারে বৌয়ের এই সব অত্যাচার সহ্য কর্‌তো। বৌ তো এক পা নড়ে বস্‌তেন না, ঐ বুড়ীই মর্‌তে মর্‌তে একা সংসারের সমুদয় কায করা থেকে রান্না বাড়া পর্য্যন্ত কর্‌তো। এতে পাড়ার লোকে বুড়ীকে কত নিন্দে পর্য্যন্ত করেছে, কিন্তু ও তা গায়েই করে নাই। তাইতে মনে হয়—এ কায এদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তবে ভগবান জানেন —লোকের মনের কথা।

দারোগাবাবু নিরুদ্ধশ্বাসে সব শুনিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইবার হাসিয়া বিনয়সূচক শির আন্দোলন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা হুজুর, এত সব খবর আপনি জান্‌লেন কি করে?

দারোগা বাবু একটু হাসিয়া বুকপকেটে হাত পূরিতে পূরিতে বলিলেন—জান্‌লাম কি করে? এই দেখুন! বলিয়া মুখুয্যে মশায়ের হাতে একখানি পত্র দিলেন।

সতীশের তখন চৈতন্য হইয়াছিল। এতক্ষণ সে কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, মুখুয্যে মশায় মনে মনে পত্র পড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও তাঁহার স্কন্ধদেশে চিবুক স্পর্শ করিয়া পত্র পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু বলিলেন—জোরে পড়ুন, মুখুয্যে মশায়! সবাইকে শুনিয়ে দিন।

মুখুয্যে মশায় পড়িতে লাগিলেন———

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত দারোগাবাবু মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

গত কল্য হইতে আমার স্বামী ও শ্বাশুরী ঠাকুরাণী আমায় খাইতে দেন নাই। এবং আমাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছেন। আমার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম হদিলপুর। এলাকা থানা চকদীঘি। আমাকে ইঁহারা ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাকে মারিয়া ফেলিবেন। তারপর আমার স্বামী আবার বিবাহ করিবেন। অতএব আপনার শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, পত্র পাঠমাত্র আসিয়া আমাকে খুন হইতে উদ্ধার করিবেন। আমি নিরুপায়। আপনি যেন অতি সত্বর

পত্র পাঠমাত্র অতি অবশ্য অবশ্য আসিবেন। কাল বিলম্ব করিবেন না। ইতি ১১ই মাঘ।

নিঃ শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী, গ্রাম হদিলপুর।

পত্র শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সতীশের মাথার মধ্যে একট' যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—তাহার চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। কাণ জ্বালা করিয়া উঠিল; কেবল শোঁ। শোঁ। এক শব্দ শুনিতে লাগিল মাত্র।

সতীশকে জোরে এক ধাক্কা মারিয়া হুঁস্ করান' হইল।

দারোগাবাবু সতীশকে পত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কার হাতের লেখা।

অতি কষ্টে সতীশ উত্তর দিল—আমার মৃত পত্নীরই বটে!

সই কার?

সইও তো তারই বোধ হচ্ছে!

এ সত্যি?

কখ্‌খনো নয় হুজুর, এ সব তার বদ্‌মাইসী—বলিতে বলিতে দারোগা-বাবুর পদ ধারণ করিয়া বলিল—এ সব তার সয়তানী, হুজুর। এ শুধু আমাদিকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যে।

দারোগা বাবু পদ ছাড়াইয়া লইয়া, কোমল স্বরে তাহাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পানে প্রশ্নপূর্ণ এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—আমারও তাই মনে হয়, হুজুর, এ সব তারই কারসাজী।

দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হইলেন। এমন সময় গৃহ হইতে সতীশের মা আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিয়া, দারোগাবাবুর সম্মুখে পড়িয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে কহিতে লাগিলেন—বাবা, দোহাই দারোগা বাবা, তুমি আমার ছেলে। নারায়ণ জানেন, ধর্ম্ম জানেন, এই বাসিমুখে বল্‌চি বাবা আমরা কিছুই জানি না। গেল তিন দিন তো জ্বরে আমার সাঁনই ছিল না। সতু আজ দু'দিন থেকে আমারই ঘরে শোয়। দোহাই বাবা, বিশ্বাস কর' বাবা, যে মহাপাতকী মিথ্যা বল্‌বে তার যেন বেটা মরে, মহাব্যাধি হয়, সর্ব্বনাশ হয়, বজ্রাঘাত হয়! যে দিব্যি কর্‌তে বল' বাবা সেই দিব্যিই কর্‌চি—তামা তুলসী শালগ্রাম ছুঁয়ে বল্‌তে বল' তাও বল্‌চি বাবা—আমরা এর কিছু জানি না, বাবা। নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিও না বাবা, তা'তে তোমার ভাল হবে না—দোহাই বাবা!

সকলেই তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করাতে তিনি আরও অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—ওরে এমন কালসাপ দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলাম গো বাবা! ওগো তুমি কোথায় আছ গো—ইত্যাদি।

দারোগাবাবু শেষে একটা ধমক্ দিলে তবে সতীশের মা কতক শান্ত হন্।

দারোগা খানাতল্লাসী প্রভৃতি অন্যান্য তদন্ত সারিয়া কহিলেন—দেখো রামলছ্‌মন সিং তোম্ ঠিক্‌সে ইন্ লোককো লে আও।

সতীশের মাকে কহিলেন—চলুন্ থানায় এখন, তারপর যা হয় হবে।

পুলিশের দারোগা—সুতরাং মুখুয্যে মশায় তাঁহাকে একবার আড়ালে ডাকিলেন, দারোগাবাবু অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন—বলুন না এই খানেই বলুন্ না—যা বল্‌বার।

মুখুয্যে মশায় আমতা আমতা করিতে লাগলেন। দারোগাবাবু হাসিয়া একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—সেদিন আর নেই মুখুয্যে মশায়। আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও সাধ্য মতে এতটুকু অবিচার হ'তে দেব না—এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। (কনেষ্টবলের প্রতি) লেও, চলো! (পুনরায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি) তবে আসি, নমস্কার।

সতীশের মা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—সে কি বাবা? আমি যে বামুনের বিধবা, আমি কি থানায় যেতে পারি? না, আমি কোনও জন্মে গিয়েছিলাম? আমরা গাঁয়ের শেষে ঐ হলা চাষার বাগান পর্য্যন্ত কখনও যাই নাই যে। তুমি জ্ঞানবান্ দারোগা হয়ে এ কি কথা বল্‌চ, বাবা?

কি করবো বলুন ——যেতেই হবে, আইন যে এই।

এবার আর তাঁর সম্ভ্রম রহিল না তিনি গালাগালি সুরু করিয়া দিলেন। সকলেই অমনি হাঁ হাঁ করিয়া বন্ধ করাইল।

ভয়ে আতঙ্কে লজ্জায় এবং আকস্মিক এই মিথ্যা অপবাদের বোঝায় সতীশের মাথা নুইয়া পড়িল। পা' দুটা এত ভারি বোধ হইল যেন মাটি হইতে তাহারা আর উঠিতেই চায় না।

এমন সময়ে আলুলায়িত নিবিড়-কৃষ্ণকুন্তলা, অযত্নাবৃতা দেহবল্লী, মলিন বস্ত্রপরিহিতা গৌরী শ্যাম-নিটোল বাহু প্রসারিয়া দারোগার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গৌরীর মুখ ভারি, চোখ লাল জবার মত, গালে অশ্রু-ধারার সাদাটে' দাগ। তার কণ্ঠ নিষ্কম্প, দৃষ্টি স্থির, স্বর গম্ভীর, প্রতিজ্ঞা দৃঢ়। বলিল—দারোগাবাবু আমার স্বামী ও শ্বাশুড়ী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি আমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে সতীনকে হত্যা করেছি

...আমি খুন করেছি...আমায় গ্রেপ্তার করুন, আমি দোষী...সাজা আমার পাওনা।...এঁরা নির্দ্দোষী, এঁরা এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না।—

চিরস্বল্পভাষিণী, সদা-সলজ্জিতা, সঙ্কোচময়ী গৌরীর এই প্রগল্‌ভতা, এই অসমসাহসিক হত্যা এবং এই আশ্চর্য্য স্বীকারোক্তি আর সর্ব্বোপরি তাহার মহিমাময়ী নারীশ্রীতে শক্তুভোজী হৃদয়হীন কনেষ্টবল হইতে দারোগাবাবু পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক, হইয়া গেল।

* * * *

গৌরী হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইল।

সতীশের মা এত সহজে বিপন্মুক্ত হইলেন বলিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা তুলিয়া বলিলেন—ও বাবা, পেটে পেটে এত? নতুন বৌটা বজ্জাত ছিল বটে, কিন্তু এমন ধড়ীবাজ ছিল না।

সতীশ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—তাই ডাক্‌বামাত্র অমনি শুর্ শুর্ করে সেদিন চলে এল। অমন জলজ্যান্ত মানুষটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেল্লে? অঁা? আন্নার স্মৃতিতে সতীশের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

গ্রামে কিন্তু যে শুনিল সেই বিস্মিত হইল; কেহ কেহ বলিল, অসম্ভব! স্বামী ও শাশুড়ীকে বাঁচাইতে গিয়াই এ দোষ সে নিজের মাথায় লইয়াছে।

কয়েকমাস পরে জেলখানা হইতে এক পরোয়ানা আসিল যে বিচারে গৌরীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে—সতীশকে সে জন্মের শোধ একবার দেখিতে চাহে।

'সে মহাপাতকিনীর আর মুখদর্শন করিব না' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সতীশ তাহার উত্তর লিখিয়া দিল।

ভাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্র আজ বছর দেড়েক যে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেছে, ইহাতে গ্রামের প্রবীণ লোকেরা মাথা নাড়িয়া বলিল—"নিশ্চয়ই উহার একটা গভীর দুরভিসন্ধি আছে।" তাহারা সুরেন্দ্রকে যথোচিত সাবধানও করিয়া দিল। কিন্তু সে বড় একটা গা করিল না। ক্ষুণ্ণ হিতৈষীগণ ক্রমে সুরেন্দ্রের উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"আমাদের কথা এখন শুনচো না, শেষে পস্তাতে হবে কিন্তু। হরেন—যাকে তুমি মায়ের পেটের ভাই বলে মনে করচ, সে-ই কিন্তু তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।"

সুরেন্দ্র একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"হরেন আমার ভাই, ছোট ভাই! মা যখন মারা গেলেন, তখন ও যে আমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও কোথাও থাক্‌তো না। আমি ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় বটে—তা হলেও আমার মনে হয়, আমি যেন ওকে মানুষ করেচি। ওকি আমার শত্রুতা কর্‌তে পারে?"

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তামাক খাইবার জন্য খড়ের নুটি পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"হরিচরণ উইল কর্‌বে, তা জান?"

সুরেন্দ্র একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—"তাতে আমার কি? বাবা উইল কর্‌চেন্ আমরা তাঁর ছেলে, আমাদের নামেই ত' উইল কর্‌চেন্? এতে আর হরেন্ আমার শত্রু হলো কিসে? যাক্‌গে

চক্রবর্ত্তী জ্যাঠা, বাবা যা কর্‌বেন্ তাই হবে! বাবা থাক্‌তে আমিই বা কে, আর হরেনই বা কে?"

পাড়াগাঁয়ের মেঠো হাওয়ার মত সেখানকার লোকের হৃদয়গুলিও অবাধ এবং নির্ম্মল। তাহাতে কয়লা গুঁড়ির ভেজাল নাই। তবু চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রর উক্ত স্নেহপ্রবণ বিশ্বাসভরা উত্তরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনি নিবারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া সুরেন্দ্রর অভিমতও জানাইলেন।

মুখুয্যে মশায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিচরণ যে সুরেন্দ্রকে একবারে ফাঁকি দিবে, এ কথা তোমায় কে বল্‌ল?"

"হরেন্দ্রর স্ত্রীই এ কথা নদীর ঘাটে আমার স্ত্রীকে বলেছে।"

"হরেন্দ্রর স্ত্রী কি বলেছে—বল তো শুনি আগে!"

চন্দ্র বলিল—"হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে যে, একে তার শ্বশুরের বয়স হয়েছে, তাতে তাঁর শরীরও ভাল নেই; এই সব কারণে হরেন্দ্রের ইচ্ছা যে যা-কিছু আছে বাপ থাক্‌তে থাক্‌তে তার একটা বিধি ব্যবস্থা হয়ে যায়। নৈলে বাপের অবর্ত্তমানে ঐ নিয়ে শেষে আবার কোনও গোল-যোগ ঘটে—সেটা তো আর ভাল নয়! ঘরে আবার ঐ বিধবা মেয়ে ক্ষ্যান্ত রয়েছে—বাপ যদি নিজে কিছু দিয়ে যায়, তা হলে ও বেচারীও কিছু পায়! এ কথায় আমার স্ত্রী বলেছিল—সে তো ভালই। দুই ভাইও যেমন কিছু কিছু পাবে, বোনটিরও তো তেমনি কিছু পাওয়া উচিত। মা মরে যাওয়ার পর, ঐ তো বুক দিয়ে এতদিন সংসারটা খাড়া রেখেছে। এতেই হরেন্দ্রর স্ত্রী বলেছে—যে তার শ্বশুরের ইচ্ছে নয় যে তিনি তাঁর বড় ছেলেকে কিছু দেন।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেশ অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ চন্দর, আমার মনে হয়, এ সমস্ত ঐ ক্ষ্যান্ত ছুঁড়িরই কারসাজী। হরা ত জন্মকুচুটে, কিন্তু সে যে এতটা কর্‌তে সাহস কর্‌বে, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না।"

"না দাদা, তুমি বুঝ্‌তে পারচ না। দুজনে মিলেই ওরা এ কায কর্‌চে। হরার তেজটা তো তুমি আজকাল দেখ নাই! ওরে বাপ্‌রে, তেজে মট্‌মট্‌ কর্‌চে; বাইশ টাকার নায়েবী করে' মাটিতে আর তার পা পড়ে না। আর কি সমস্ত রাজা উজীর মারা গল্প—শুন্‌লে একবারে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।"

"বলো কি?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও উত্তেজিত হইয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গা টিপিয়া বলিতে লাগিলেন—"হঁা দাদা, তবে আর বল্‌চি কি? হরা বাড়ী এলে, সুরেন্‌ ভাইয়ের জন্যে একবারে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়; কোথায় কি হরেন ভাল বাসে—এই সব যোগাড়যন্ত্র করতে সুরেনের নাইবার খাবার পর্য্যন্ত অবকাশ থাকে না। বড় ভাই হয়ে ঠিক যেন চাকরের মতন খাটে, আর হরেন্‌ সেই বড় ভাইকে কি না সেদিন আমার সাম্‌নে বল্‌লে—'তুমি একটা গাধা।' সুরেন্‌ মুখটি নীচু করে' চলে গেল। আমি থাক্‌তে পার্‌লাম না, হরেনকে একটু বক্‌লাম—সেই থেকে বাবু আমার সঙ্গে আর কথাই কন্‌ না।"

"বলো কি চন্দোর?"

"কি বল্‌বো দাদা? সুরেন্‌কে বল্‌তে গেলাম সে বল্‌লো—"ও ছেলে মানুষ, ওর কথা কি ধর্ত্তব্য? না কি গাধা বল্‌ল বলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল?"

"আচ্ছা তুমি একবার দত্তমশায়কে খবরটা দিয়ে রাখ। আজ সন্ধ্যায় —না আজ সন্ধ্যায় নয়—কাল সকালে চল আমরা সবাই গিয়ে একবার হরিচরণকে বলিগে।"

চক্রবর্ত্তীর মুখে সহানুভূতির পবিত্র আলোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—"আমরা থাকতে গাঁয়ে ভাল মানুষের উপর কোনও অত্যাচার হতে দেব না! তা হোলে লোকে বলবে, গাঁয়ে কি কেউ মানুষ ছিল না?"

পরদিন প্রভাতে গ্রামের মাতব্বর রাম দত্ত, নিবারণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও দীনু মণ্ডল হরিচরণের গৃহে গিয়া উপস্থিত। শুনিল, অদ্য প্রত্যুষেই হরেন্দ্রের সঙ্গে হরিচরণ মহকুমায় গিয়াছেন। সুরেন্দ্র বিগত সন্ধ্যা হইতে বাড়ী নাই, হরিশ বাঁড়ুয্যের শব-সৎকার করিতে গঙ্গাতীরে গিয়াছে। এ দিকে এই সকালে তাহার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিচরণ ভট্টাচার্য্য উইল করিয়া ফিরিলেন—এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। কি যে উইল হইল, তাহা কিন্তু হরিচরণ গোপন করিলেন—লোকের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি তাহা খোলসা করিয়া কাহাকেও বলিলেন না।

যে কাজ লোকে যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, সে কায তত শীঘ্রই প্রকাশ পায়—বিশেষতঃ অন্যায় কায। সুরেন্দ্রর যাহারা হিতৈষী, তাহারা মহকুমায় গিয়া রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে খবর লইয়া জানিল যে, হরিচরণ যথাসর্ব্বস্ব স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিয়া দিয়াছেন—কেবল পাঁচ বিঘা জমি ও যৎসামান্য পিতল কাঁসার জিনিষ তাঁহার বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দেব্যার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযকে দান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অবাধ্য প্রভৃতি কারণে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার অবর্ত্তমানে বংশপরম্পরাসূত্রে ভোগদখল করিতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

এই অদ্ভূত উইলের কথা শুনিয়া গ্রামসুদ্ধ লোকে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল—যে এইবার সুরেন্দ্র মহা হুজ্জুৎ বাধাইবে। একে সে একগুঁয়ে লোক, তাহাতে আবার দুইবেলা দুইমুঠো ভাতেও যখন তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইল, তখন এবার সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না।

লোকে অধীর উৎকণ্ঠায় দুই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল; কিন্তু সুরেন্দ্রর কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। সে যেমন বেলা তৃতীয় প্রহরে যজমানদের বাড়ী পূজা সারিয়া, বামহস্তে নৈবেদ্যের ছোট ছোট রেকাবীগুলিকে উপর উপর রাখিয়া গামছায় ঝুলাইয়া, খালি পায়ে খালি গায়ে বাড়ী ফিরিত—তেমনই ফিরিয়া আসিতেছে। মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে, চাহনিটি আগেকার মতই স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্ভীক, এবং নিশ্চিন্ত।

লোকে ভাবিয়াছিল, পিতার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতে দুঃখ নিবেদন করিতে সুরেন্দ্র নিজেই তাহাদের দ্বারস্থ হইবে; কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন লোকের বিস্ময় ও কৌতূহল আর বাধা মানিল না।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন—"বলি, তোমার মতলবখানা কি, বল দেখি? এত বড় যে একটা কাণ্ড হল—আমাদিকে তা কি জানাতেও নেই? আমরা কি তোমার শত্রু?"

সুরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন জ্যাঠামশায়, কি কাণ্ড হয়েছে? আপনি কি বল্‌চেন, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"চিরকালই কি খোকাটি হয়ে থাক্‌বে? "কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না'! তোমাকে সে দিন আমি বলেছিলাম কি না যে, হরা তোমার শত্রু! তখন যে ভাইয়ের পানে বড্ড টান দেখিয়েছিলে। এখন? খুব ভাইয়ের কায করেছে, নয়?"

সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—বলিল—"এই কথা জ্যাঠা মশায়? এতে হয়েছে কি? আপনি কি মনে করেন যে, বাবা, হরেন্ সবাই আমায় বল্‌বে—তুমি তোমার ছেলেপিলে নিয়ে বেরিয়ে যাও? তাই কখনও পারে? এ উইলের কথা তো আমি পরশু দিনই শুনেছি।"

"তুই অবাক কর্‌লি, সুরেন্! তুই ভাবচিস্ কি? তোকে যদি না তাড়াবে, তোকে যদি না ফাঁকি দেবে—তবে এ সব উইল ফুইল করবার দরকার ছিল কী?"

সুরেন্দ্র একটু চিন্তা করিল। তাহার মুখমণ্ডলে হঠাৎ চিন্তার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এখন আজ যদি তোকে ওরা বের করে দেয়, তা হ'লে তুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবি? খাবিই বা কি?"

সুরেন্দ্র আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কুঞ্চিত ভ্রূযুগের নীচে সুরেন্দ্র

বিস্ফারিত আয়ত চক্ষুদুটির নির্নিমেষ দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। সুরেন্দ্র একটু চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তা হ'লে আমি কি করবো?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আদালত ভিন্ন এর মীমাংসা আর কে করবে?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরেন্দ্র দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আদালত? বাপের নামে? ছোট ভাইয়ের নামে? বড় দিদির নামে? আদালত? এ আমি পারবো না—কপালে যা থাকে তাই হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহকুমা যাইবার তিন দিন আগে হইতেই হরিচরণের যে জ্বর আসিয়াছিল—সে জ্বর এখনও ছাড়ে নাই। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা অপেক্ষা করিয়াছিল যে, হরিচরণের জ্বর ছাড়িলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া যে কোন উপায়ে এ উইল রদ করাইবে। সুরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে, তাহাকে এমন করিয়া ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে তাহারা দিবে না। কিন্তু সবাই যখন শুনিল যে, বৃদ্ধের অসুখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে, তখন সকলে একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা পথ্যাদির প্রকরণ প্রভৃতি নানা বাক্যালাপের পর নিবারণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"দেখ হরি ভায়া,

তুমি উইলটা এই সময় বদ্‌লিয়ে দিয়ে যাও। এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? লোকে তোমাকে ছি ছি তো কর্‌চেই, তার সঙ্গে আমরাও যে মুখ দেখাতে পারচি না।”

কক্ষে হরেন্দ্র একটা মোড়ায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া ঘৃণাভরে একবার অভ্যাগতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় কাগজ পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

হরিচরণ নিরুত্তর। চক্ষু বুঁজিয়া নিশ্চেষ্টভাবে যেমন শুইয়াছিলেন, তেমনই শুইয়া রহিলেন।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিল—“কি ভাই, শুন্‌চ’? মুখুয্যে মশায় কি বল্‌লেন?”

হরিচরণ মুদ্রিত নেত্রেই কহিল—“তা কি করব বল? আমার—”

হরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—“দেখচেন, জ্বরে ওঁর হুঁস নেই, এখন আর বিরক্ত নাই বা কর্‌লেন?”

চক্রবর্ত্তী ও রাম দত্ত উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“তুমি চুপ করে’ থাক, নয় ঘর হ’তে বেরিয়ে যাও। যে কায করেচ, গলায় দড়ি দিয়ে মর গে!”

হরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—“কী, আমি বেরিয়ে যাব? এ বাড়ী আমার তা জান? বেরোও বল্‌চি, বেরোও আমার বাড়ী থেকে!”

দত্ত মহাশয় ধীরভাবে বলিলেন—“কার সঙ্গে কথা কইচ’ জান? এ বাড়ী তোমার নয়, এ বাড়ী ভট্‌চাজ মশায়ের। তা ছাড়া, কার মাটিতে এ বাড়ী জান? আমি ইচ্ছে কর্‌লে এ বাড়ীতে ভাগাড় বসাতে পারি, জেনে রেখো” বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, “এখুনি ঘরে থেকে বেরোও।”

হরেন্দ্র মন্ত্রাহতের ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হরিচরণ এই বচসার সময় একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভট্‌চাজ্‌ মশায়, এর জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। একটু কেবল ধমক্‌ দিয়েছি। হাঁ, এখন বলুন, এ কাজ আপনি কেন করলেন?"

হরিচরণ ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। গ্রামের জমিদারের কাছে এরূপ একটা অন্যায় আচরণের সন্তোষপ্রদ কৈফিয়ৎ দিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া—একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না। হরিচরণের মাথা ঘুরিতেছিল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতেছিল দেখিয়া নিবারণ বলিলেন—"ও কথা না হয় যাক্‌গে, ও আমরা সবই বুঝতে পেরেছি। এখন এ উইল্‌ বদ্‌লে সুরেন্‌কে তার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে আপনি রাজী আছেন ত?"

হরিচরণ তাঁহার ব্যারামের যন্ত্রণা অপেক্ষা উত্তরের জন্য অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'হাঁ' 'না' কী যে বলিবেন মাথায় কিছুই যোগাইল না। অশান্তি হইতে আশু নিষ্কৃতির জন্য তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, বাবু, আমি একটু সুস্থ হলেই এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে'—যা হয় তাই করব।"

চন্দ্র বলিল—"কি আর এমন তোমার ন'শো পঞ্চাশখানা তালুক মুলুক আছে যে, তার জন্যে এত সব পরামর্শের প্রয়োজন? এই যে কেলেঙ্কারিটা করে' এলে, ক'জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ভাই?"

নিবারণ, চন্দ্রকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ধর', ঈশ্বর না করুন্, যদি না-ই বাঁচ'। অবিশ্যি বয়সও তো হয়েছে। তখন ও বেচারীর কি দশা হবে ?"

হরিচরণ এতক্ষণ একটা বালিশে ঠেশ্ দিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করাইলেন; কিন্তু কোন কথারই শেষ নিষ্পত্তি সে দিন আর হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে হরেন্দ্র ক্ষান্তমণিকে ডাকিয়া কহিল—"দেখচ' দিদি, বদ্‌মাইসের কাণ্ডখানা দেখচ'? গাঁয়ের যত সব মজামারা বজ্জাতদিকে দিয়ে ওকালতী করানোর ধুম দেখচ?"

ক্ষান্ত দক্ষিণ হস্তের তালুটি হরেন্দ্রের সম্মুখে পাতিয়া নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে ছল-ছল চক্ষে কহিল—"ভাই, তুমিই দেখ, তুমিই দেখ। তুমি তো বাড়ীতে থাক না—তুমিই দেখ; আমার দেখে দেখে হাড়-মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। মনে হয় আফিং খেয়ে মরি।"

"তুমি সবুর কর, দিদি। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়চি না। আজ কালের মধ্যেই করে' ফেল্‌চি, তুমি দেখে নিও।"

এমন সময়ে যেমনি সুরেন্দ্র কোঁচার কাপড়ে করিয়া চারিটি জীয়ন্ত মাগুর মাছ লইয়া উপস্থিত হইল, অমনি ক্ষান্ত একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে হতভাগা?"

সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল—"দিদি একেবারে চব্বিশ.

ঘণ্টাই আগুন! হরেন্ মাগুর মাছ ভালবাসে, তাই গরাইদের পুকুরে মাছ ধর্‌তে গিয়েছিলাম—"

হরেন্দ্র বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে ক্ষান্তকে কহিল—"দিদি, ও মাছ আমি খাব না।" বলিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই যে হরিচরণের মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই মূর্চ্ছাই তাঁহার কাল। সন্ধ্যার পর হইতেই জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িল। জ্বরের ঘোরে সারা রাত্রি কত কি অসম্বদ্ধ বকিয়া প্রাতে যেমন একটু নিদ্রাবিষ্ট হইলেন, অমনি সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত সুরেন্দ্রের দেহখানি পিতার শয্যাপার্শ্বে মেঝের উপর তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িল।

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। তপনদেবের প্রচুর আলো পল্লীগ্রামের অবাধ পথে, গাছে, শাখায়, পাতায়, লতায়, জানালায় ঠিকরিয়া পড়িয়া, শিশুর শুভ্র হাসিতে মায়ের মুখের মত ধরণীকে শোভাময় করিয়া তুলিয়াছিল।

হঠাৎ গোলমালে এবং উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে সুরেন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, হরেন্দ্র সতীশ এবং ক্ষান্ত তিন জনে ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষু হরিচরণকে নীচে নামাইতেছে। সুরেন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাশ্রুনেত্রে পিতাকে আঙ্গিনায় তুলসী-মঞ্চতলে শোয়াইল। অল্পক্ষণ পরেই হরিচরণ তাঁহার ষাঠ বৎসরের পরিচিত সংসারের সহিত তাঁহার অকর্ম্মণ্য প্রাণহীন দেহটিকে রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পিতার সৎকার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথেই সুরেন্দ্রের জ্বর আসিল। বাটী পৌছিয়াই সে লেপ মুড়ি দিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"সুরেন্দ্র যে এই ১৫টা রাত্রি উপরি উপরি জাগিয়া রোগীর সেবা করিয়াছে, দিনেও একটু বিশ্রাম করিতে পায় নাই—তার উপর এই দুর্ভাবনা ও মনকষ্ট, তাই নাড়ি একটু চঞ্চল হইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ জ্বর তিন দিন মাত্র থাকিয়াই বিরাম হইবে।"

হরেন্দ্র তবু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। চুপে চুপে গিয়া ক্ষান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, কেমন বুঝ্‌চ? আবার কি বিপদে পড়্‌বো নাকি?"

ক্ষান্ত তখন কাপড় চোপড় কাচা ও ঘর ধোয়া প্রভৃতি কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল; তাই সে তাড়াতাড়ি দু' এক কথায় উত্তর দিল—"তা ভাই, সে বড় আশ্চর্য্য নয়, যে পোড়া কপাল আমাদের।"

হরেন্দ্র বলিল—"তাই তো বল্‌চি, যে শত্রুর পুরী হয়েছে, যদি কিছু হয় তো শালারা বলবে মেরে ফেলেচে; আর অমনি হাতে দড়ি।"

"মিছে নয় ভাই, যা' বলেচ'। তা' হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়! আচ্ছা, এই হাতের কাযগুলো সেরে পরামর্শ কর্‌চি। তুমি একটু দাঁড়াও।"

দুই দিন ধরিয়া পরামর্শ হইল। তাহাতে এই স্থির হইল যে, সুরেন্দ্রকে সপরিবারে এ বাটি হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতেই হইবে। ইহাতে কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। আর এই কথা জ্ঞাপন করার ভার ক্ষান্ত নিজেই গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিন প্রভাতে সুরেন্দ্র জ্বরে বেঘোর হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষান্তমণি তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"সুরো,

শুন্‌চিস—আর অমন ঠাট করে’ পড়ে থাক্‌লে হবে না। নে নে ওঠ্‌।”

সুরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে দিদির মুখপানে চাহিয়া বলিল—“আমি কি অমনি সাধ করে পড়ে’ আছি, দিদি? বড় কাবু না হ’লে আমি পড়ে’ নাই। একবার খোঁজও তো নাও না, তার আর কী বুঝ্‌বে?”

“ঢং দেখে বাঁচি না। অমন মালগোট্টা শরীল—হবেছে কি যে, সারাদিন খোঁজ তল্লাস কর্‌তে হবে?” ক্রমে স্বর নামাইয়া বলিল—“তা সে যা’ হয়, হোক্‌গে; এখন যা’ বল্‌তে এসেচি শোন,—আমি কাযের মানুষ কায কামাই করে দাঁড়াতে পার্‌চি না। হরেন্‌ বল্‌চে যে তোদিকে আর এ বাড়ীতে সে থাক্‌তে দেবে না!”

কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্র একবার আঁৎকাইয়া উঠিল। প্রথমটা সে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতর খোঁচান’ ভীমরুলের চাকের বোঁ বোঁ শব্দের মত একটা শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—তখন তাহার মনে হইল যেন তাহাকে শত ভীমরুলে দংশন করিতেছে। অভিমানে অপমানে দুঃখে রোগে যাতনায় সুরেন্দ্র একবারে নিরুত্তর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

নিরুত্তরের শানে আদেশকে আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া ক্ষান্ত প্রশ্ন করিল—“চুপ করে’ রৈলি যে? কখন যাবি বল? আমার অনেক কায রয়েছে।”

এবার আর সুরেন্দ্র থাকিতে পারিল না। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। বড় বড় উত্তপ্ত চোখের জলের ফোঁটাগুলি তাহার রুগ্ন কপোল

আর্দ্র করিয়া বিছানায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—"কখন যাব? দিদি, কোথায় যাব? খাব কী? একে এই দুঃসময়, নানান্ দিকে ব্যতিব্যস্ত, কে জায়গা দেবে? এই অশৌচ, আমার এই অসুখ, ওদিকে আঁতুরে রোগী, দশ দিনের কাঁচা ছেলে, ছোট ছোট তিনটি মেয়ে; এ অবস্থায় কোথা যাব, দিদি?"

ক্ষান্তর মন একটু নরম যদিও হইল, তবুও সে এ রুগ্ন নিরুপায়কে শ্লেষবিদ্ধ করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না। বলিল—"সে কি, তোমার এত হিতৈষী বন্ধু? ঐ চন্দোর চক্কোবর্ত্তী, নিবারণ মুখুয্যে, রাম দত্ত, যারা তোমার জন্যে অনাহুত ওকালতী কর্‌তে আস্‌তে পারে, আর তারা তোমায় একটু জায়গা দিতে পারে না? কথায় তারা এত দরদ জানায়, আসলে কিছু কর্‌বে না—তাও কি হয়?"

সুরেন্দ্র বুঝিল, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতেই হইবে। তবুও বলিল "এই আজ মোটে চারদিন বাবা গেলেন, এখন যদি তোমরা আমায় তাড়িয়ে দাও, তা হলে বড় কেলেঙ্কারী হবে। তার চেয়ে বাবার কাযটা ভাল ভালয় হয়ে যাক্, আমার জ্বরটাও সারুক। এর মধ্যে যা' হয় মাথা গুঁজ্‌বার মত একটা জায়গা করে নি'—তারপর আমি আপনিই যাব; এখন গেলে যে লোকে তোমাদিকে নিন্দে কর্‌বে, দিদি?"

"হরেন্ বলে, সে নিন্দে হয়, তার হবে। তার জন্যে তোমার ভাবনা কি?"

সুরেন্দ্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—"কী? হরেনের নিন্দে হলে আমার কী?"

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র সব শুনিতেছিল। বেগে গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিয়া কহিল—"আর তোমায় ভালবাসা দেখাতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে। এ বাড়ী আমার, তুমি এই মুহূর্ত্তেই বেরোও।"

বাহিরে আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রিত আকাশে তখন বাদলে বাওরে তুমুল কলকোলাহল চলিতেছিল—সুরেন্দ্র নীরবে একবার বাতায়নপথে বহিঃ-প্রকৃতিকে দেখিয়া লইল। মাথার গোড়ায় একগাছি বাঁশের লাঠি ছিল, তাহাতে ভর দিয়া উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—"বড় বৌ, ছেলেদিকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" বড় বৌ কাঁদিয়া উঠিল—মেয়ে তিনটি মার কাছেই বসিয়াছিল, তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র কঠোর কণ্ঠে বলিল—"এসো—দেরী করো না, বল্‌চি। আমার ছাতাটা আমায় দাও।" জ্বরে তাহার চক্ষু জবার মত লাল তো ছিলই এখন সে দু'টি আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল।

অঝোর বাদলে সুরেন্দ্র শতছিদ্র ছাতাটি মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রামের পথে বাহির হইল। পশ্চাতে সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া রোরুদ্যমানা পত্নী ও কন্যাত্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাটি হইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্র বরাবর রামদত্তর নিকট গিয়া উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভৃত্যগণকে যে লক্ষ্মী ময়রাণীর দরুণ ঘরখানাতে এখনি সুরেন্দ্রের জন্য স্থান করিয়া দিতে আদেশ দিলেন।

লক্ষ্মী এই ঘরখানি বন্ধক রাখিয়া দত্তমহাশয়ের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল ;—কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই সে ইহধাম

পরিত্যাগ করে। তাহার আর কোন ওয়ারিশ না থাকায়, এ ঘরখানি এখন দত্ত মহাশয়েরই সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দত্তমহাশয় বলিলেন—"এ ঘরখানি মায় মাটি সুদ্ধ আমি তোমায় দান কর্‌লাম, সুরেন্! পরে রীতিমত লেখাপড়া করে' দেব'খন। আপাতত ওখানে গিয়ে দাঁড়াও গে তো?"

সুরেন্দ্র জ্বরে ও ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কি বলিতে যাইতেছিল, দত্ত মহাশয় তাহাকে বাধা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈজসপত্র খাদ্য প্রভৃতি সমস্তই আসিয়া হাজির হইল।

হরেন্দ্রর এ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার কাহিনী গ্রামে রাষ্ট্র হইতে দেরী লাগিল না। ঈদৃশ পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিশোধ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রামের একদল লোক প্রস্তুত হইয়া দত্তমহাশয় ও সুরেন্দ্রর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাড়াইল। দত্তমহাশয় তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যসহকারে সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুরেন্দ্রও অনুরোধ করিল যেন হরেন্দ্রর উপর কেহ কোনও রূপ অত্যাচার না করে। অবমানিত ভ্রাতৃস্নেহকে সুরেন্দ্র এইরূপে রাজাধিরাজের মণি-মুকুটে ভূষিত করিয়া দিল।

সুরেন্দ্রর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, আশ্রয় পাইয়াছে, গ্রামের সর্ব্বসাধারণে তাহাকে সাহায্য করিতেছে, লোকে বলিতেছে যে চাঁদা তুলিয়া সুরেন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিয়া দিবে, রামদত্ত ইহারই মধ্যে দশটাকা বেতনে তাঁহার সেরেস্তায় সুরেন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন—ইত্যাদি সংবাদ হরেন্দ্র যতই শুনিতেছিল, ততই সুরেন্দ্রর উপর তাহার আক্রোশ বাড়িতে লাগিল।

গ্রামের লোকের উপর সে তো চটিয়া আগুন। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সে যাহাকে পথের ভিখারী করিতে চায়, লোকে কেন তাহাকে আদর করিয়া তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিবে? সুরেন্দ্র নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা বহন করিতেছে, সে যে বাধা দিতেছে না—হরেন্দ্র ভাবিল, ইহা কেবল ভয়! তবু সে তাহাকে আশানুরূপ জব্দ করিতে পারিতেছে না। হরেন্দ্র আপনার এই ক্ষমতাদৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের সময় যখন নাপিত, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ কেহই তাহার গৃহে পদার্পণ করা দূরে থাকুক্‌, আহ্বানই গ্রহণ করিল না—তখন হরেন্দ্র ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহার ব্যর্থ-প্রয়াসের ভস্ম-স্তূপের উপর আত্মহত্যার সংকল্প করিতেও কষ্ট বোধ করিল না। কিন্তু সে ক্ষমতাও তাহার নাই। তাহার ইচ্ছা হইল—এই মুহূর্ত্তে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিশ্বদাহী আগুন জ্বালাইয়া দেয়—অথচ ইহাও তাহার সাধ্যাতীত।

সুরেন্দ্রর গৃহে পিতৃশ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন। গ্রাম সুদ্ধ লোক তাহার বাড়ীতে কাযে অকাযে কারণে অকারণে ঘুরিতেছে, হুকুম চালাইতেছে, কায করিতেছে, গোলমাল করিতেছে, নূতন ছোট ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া মুরুব্বীয়ানা করিতেছে—অর্থাৎ এ যেন গ্রামবাসী সকলেরই পিতৃশ্রাদ্ধ। হরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় থাকে, মাইনর চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কাযেই শিক্ষিত, জুতা পায়ে না দিয়া রাস্তায় বাহির হয় না, ঘড়ি দেখিয়া সময় নিরূপণ করে—সে এ অসভ্য গ্রাম্য বর্ব্বরদের খোষামোদ করিতে পারে না—তাই সে সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইল। শ্রাদ্ধ সেইখানেই করিবে।

তিন চারি মাস পরে হরেন্দ্র পরিবারবর্গকে পুনরায় গ্রামে রাখিয়া

কলিকাতা ফিরিয়া গেল। সতীশের এবার তাহার ছোট মামার—সম্প্রতি মামাবাবুর—অধীনে মাসিক ছয় টাকা বেতনে একটি চাক্‌রী হইয়াছে বলিয়া, সে আর আসে নাই।

ক্ষান্তমণির মনোভাবটা তবু হরেন্দ্রর উপর আর তেমন প্রসন্ন নহে—এটা অনেকেই লক্ষ্য করিল। বিশেষতঃ গ্রামের মহিলামহলে ইহা লইয়া বেশ একটা কাণাঘুঁসা চলিতে লাগিল।

ক্ষান্তমণির প্রাণপণ সহযোগিতায় হরেন্দ্র সুরেন্দ্রকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে যে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্য ক্ষান্তর সঙ্গেও মহিলারা ভাল করিয়া মিশে না, কাযেই আসল ব্যাপারটা কেহই ভাল জানিল না। যে দিন হরেন্দ্রর স্ত্রীর সহিত ক্ষান্তর একটি ছোটখাট কলহ হয়, সেই দিনই সকলে টের পাইয়াছে যে, ক্ষান্তমণির বহুদিন সঞ্চিত পাঁচশো খানি রৌপ্য-মুদ্রা ছিল, তাহার উপর হরেন্দ্রর চিরকাল একটা আকর্ষণ ছিল—সম্প্রতি হরেন্দ্র সেগুলিকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সতীশকে ভাল চাকরী করিয়া দিবে, ক্ষান্তকে তীর্থ করাইবে, আমরণ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সমস্ত ব্যয় বহন করিবে, প্রভৃতি মধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া, ক্ষান্তমণি ছোট ভাইয়ের নিকট সেই রাশিপ্রমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে—তাহার যে পুনরুদ্ধার কখনও হইবে, এ আশা অতি অল্প বলিয়া সময় সময় ক্ষান্ত আজকাল উচ্চৈঃস্বরে রোদনও করিয়া থাকে। ইহাতেই গ্রামে আসল কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই ভাই দুই ঠাঁই হইয়া এক রকম করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। সুরেন্দ্রর আন্তরিক ইচ্ছা যে, সে গিয়া হরেন্দ্রর সঙ্গে মিট্‌মাট্ করিয়া আসে, কিন্তু সকলেই তাহার এ মতের বিপক্ষে বলিয়াই সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

গ্রামে আসিলে হরেন্দ্র নিজেও কোথাও বাহির হয় না, তাহার নিকটও কেহ যায় না—লোকের মনে এখনও তার ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি জাগরূক। কখন কখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে কোথাও গিয়া দুই দণ্ড বসে, বা কাহারও সহিত দুইটা সুখ দুঃখের আলাপ করে,—কিন্তু তাহাকে যে সকলে ঘৃণা করে, কেহই তাহাকে নিজের পাশে বসাইবে না—ভাবিতে ভাবিতে রাগে তাহার শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। এই জন্য সুরেন্দ্রর নাম পর্য্যন্ত তাহার সহিত না। পূজার ছুটি ছাড়া হরেন্দ্র বাড়ী আসাই প্রায় পরিত্যাগ করিল।

হরেন্দ্র বাটি আসিলে সুরেন্দ্রর খুবই ইচ্ছা হইত একবার তাহার নিকট যায়, কিন্তু কেহই তাহাকে যাইতে দেয় না। বিশেষতঃ দত্ত মহাশয়ও এমন ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে যখন নারাজ, তখন আর সুরেন্দ্র যায় কি করিয়া? তবুও পথে ঘাটে কোথাও দেখা হইলে সুরেন্দ্র ছোট ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। হরেন্দ্র ইহাকে অন্যরূপ ভাবিয়া অনেক সময় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত—তাহার ভয়, কি জানি যদি কিছু চাহিয়া বসে। সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনেই কাঁদিত।

শাপমুক্তি

এবারও হরেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছে। পথে দুজনের সাক্ষাৎ হওয়ায় সুরেন্দ্র স্বভাব-হাসিতে অভিষিক্ত করিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"এই যে, হরেন্ কবে এসেছ ভাই?"

হরেন্দ্র দাঁত মুখ খিঁচাইয়া অত্যন্ত রূঢ়স্বরে কহিল—"কেন তোমার কিছু চাই টাই? যা মতলব, খুলে বল।"

সুরেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, হতাভিমানে মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল! সুরেন্দ্র আজ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, মর্ম্মান্তিকরূপে অপমানিত বোধ করিল। কি করিয়া বুঝাইবে সে মাসিক দশ টাকা বেতনে ও নৈবেদ্যের চাউলে রাজার হালে আছে, তাহার কোন অভাবই নাই। যজমানেরা এখন তাহাকে সিধায় বেশী বেশী চাউল দেয়, দুই আনার স্থলে চারি আনা দক্ষিণা দেয়—তাহাতে তাহার অবস্থা খুবই সচ্ছল, একথা সুরেন্দ্র তাহার মদান্ধ নির্ব্বোধ ভাইটিকে কী করিয়া বুঝায়? অথচ এত বড় একটা অপমানও সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। 'কিছু চাই?' কখনও সে কি কিছু চাহিয়াছে? তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল, কণ্ঠের নীচে ভাণ্ডভরা বিষ ফেনাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখিল, তাহার ভাই বহু দূর চলিয়া গিয়াছে,—এত দূর যে আর ডাকিয়া সে বিষ নিক্ষেপ করিতে গেলে তাহাতে ফল তো হইবেই না, হয় ত পরিহাসের মত গায়ে লাগিয়া ঝরিয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরেন্দ্র নিজের মনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিল। এইদিন হইতে আর যাহাতে দুইজনে সাক্ষাৎ না হয়, তার জন্য সেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল।

আশ্বিনের শেষাশেষি। একে ত বর্ষাকাল হইলেই গ্রামে জল ঢুকে;

তাহাতে আবার খবর পাওয়া গেল দামোদরে ভীষণ বন্যা। দেখিতে দেখিতে অজয়েও তাহার প্রতিধ্বনির মত কল কল রবে বানদেবতার স্বাগত-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই বরাবর যতদূর জল আসে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া স্ফীতোচ্ছ্বল ফেণায়িত জলরাশি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ছড়াইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্র নকিপুরে কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু এই অকস্মাৎ বন্যার জন্য সেখানে তিন দিন হইতে আটকাইয়া পড়িয়াছে। খেয়ার মাঝিরা কোনও মতে সে তুফানে পাড়ি জমাইতে সাহসী নয়। শ্রাবণধারার মত বৃষ্টি ও তুফান যখন তিন দিনেও থামিল না—তখন সুরেন্দ্রকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে জমিদারের শরণাপন্ন হইল, তাহার আদেশে মাঝি একবার মাত্র খেয়া বাহিতে অগত্যা স্বীকৃত হইল।

* * * * *

বেলা প্রায় বারটা। সুরেন্দ্র সারা পথ জল ভাঙ্গিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। কোথাও মাটি নাই—গাছ পালা, লতা, বাড়ী সব যেন জলে ভাসিতেছে। কত কত ঘর পড়িয়া গিয়াছে—সেই চালের উপর হতভাগ্য নরনারীগণ নির্ব্বাসিতের মত দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। গ্রামের গবাদি পশু কতক ভাসিয়া গিয়াছে—অবশিষ্টগুলিও এই সমাগত বিপদে মুহ্যমান্ হইয়া মরিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছে। এই নিরন্ন, আশ্রয়চ্যুত, শীত-জর্জ্জর, বর্ষাধারায় অনাচ্ছাদিত অনাবৃত পল্লীবাসীদিগের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া সুরেন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইল। নিজের পরিবারের কথা মনে পড়িতেই তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। তাহার প্রধান

ভাবনা—এবার গৃহহীন হইলে কে আশ্রয় দিবে? ক্রমশ সুরেন্দ্র আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে এতই বিমনা হইয়া পড়িল যে, তাহার মাথায় নিজের কথা ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তারই আর স্থান রহিল না।

সুরেন্দ্র উত্তরপাড়ায় যখন পৌছিল, তখন দেখিল যে কেবল এই দিকেই জল আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাহার ভয়পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে একটা আশার জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল।

সুরেন্দ্র গৃহে পৌছিয়া প্রথমে স্ত্রীকন্যাগণকে দেখিয়া তাহার সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইল। জলে ভিজিয়া ও পথ হাঁটিয়া সে যে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। তখনি আবার মনে হইল, গ্রামের কী দুর্দ্দশা সে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। সকল কথা তাহার ভাল মনে না থাকিলেও, কুসমি বাগ্দীকে ঘরের চালার উপর তিন দিনের প্রসূত সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাই তাহার জন্য গৃহে একটু স্থান করিয়াই সে আবার তখনই বাহির হইয়া গেল।

কুসমি বাগ্দীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া, সুরেন্দ্র তাহার বাপের ভিটার অবস্থা দেখিতে ছুটিল। সে পথে গিয়া দেখে, সেখানে হাঁটু-ভোর জল, ঘরখানি ডুবু-ডুবু। কিয়ৎক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সে ভাবিল যে বাড়ীখানির তো পড়িতে আর বেশী দেরী নাই। কাযেই বাড়ীর লোকেরা কোথায় এই দুর্য্যোগে গিয়া দাঁড়াইবে? এ চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে কোমর-ভোর জলে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একটি অশ্বত্থতলে হরেন্দ্র, ক্ষান্তমণি, সতীশ, তাহার পত্নী,

সুরেন্দ্রর স্ত্রী ও তাহার চারিটি কন্যা গৃহহীন হইয়া কাঁদিতেছে। সুরেন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

সুরেন্দ্রকে বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া হরেন্দ্র ডাকিল—"দাদা—ও দাদা—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

সুরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইতেই গৃহহারা আত্মীয়গণকে দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্র ফিরিল। নিকটে আসিলে, হরেন্দ্র তীব্র অথচ সলজ্জ দৃষ্টিতে—পরুষ অথচ আত্মসমর্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?"

সুরেন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়াই একহাতে এক পোঁটলা ও অন্য হাতে একটা বাক্স মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল—"চল' চল' আগে বাড়ী চল—যারা যাবে যে? কতক্ষণ এমন করে' দাঁড়িয়ে আছ তোমরা? হেঁঃ—সব একেবারে ছেলেমানুষ! এস, এস।" বলিয়াই সুরেন্দ্র চলিতে লাগিল।

সাপুড়িয়ার মন্ত্রে মুগ্ধ সর্পের মত সকলেই সুরেন্দ্রের অনুসরণ করিল।

হরেন্দ্র মনে মনে অনেকগুলি কথা সাজাইয়া ডাকিল—"দাদা—"; কথা আটকাইয়া গেল। চক্ষু দিয়া সজোরে অশ্রুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্র উত্তর দিল "ভাই—"

আর কোনো কথাই হইল না।

রক্তের টান

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুঁকাটি হাতে করিয়া মুকুন্দ বলিল—"চারটে মেয়েই যখন আমাদের গলায়, তখন একটি যে পার হলো, এই যথেষ্ট! কি বল বড় বৌ?—" বলিয়া পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিল।

বড় বধূ জ্ঞানদা চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া এবং মাথাটা সজোরে ঘুরাইয়া কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সহিত বলিল—"চারটে মেয়েই আমাদের গলায় কি রকম? মেয়ের বিয়েও কি সংসার হ'তে হবে নাকি?"

মুকুন্দ হুঁকায় দীর্ঘ একটা টান দিয়া ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে ধীরভাবে বুঝাইতে লাগিল—"চারটিই আমাদের গলায় নয় কী রকম? আমার একটি, কেশবের তিনটি। আমরা দুই ভাই এক-অন্নে যখন আছি, তখন ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় আলাদা আলাদা খরচ হবে, এ তুমি কেমন কথা বলচ, বড় বৌ?"

জ্ঞানদা মুকুন্দর যুক্তি বুঝিল না। সে পুনরায় জিদ ধরিল—"তা' হবে না কেন? করলেই হয়। আর না করাতে লোকসানটা কার? তোমার একটি মেয়ে, ঠাকুরপোর তিনটি। প্রত্যেক বিয়েতে যদি দু'হাজার করে'ও খরচ হয়, তাহলে অকারণ তোমার ছ'হাজার টাকা যাবে ত!"

মুকুন্দ পত্নীর অর্থনীতি জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিল—"তুমি যে হিসাবটা করলে, ওটা নিতান্তই পাগলামি। ধর', আমারই যদি তিনটি

মেয়ে থাকতো, তাহলেও কি তুমি এই কথা বলতে? এখনও ত হওয়া অসম্ভব নয়। একঅন্নে যখন আছি, তখন সবই এক সঙ্গে হবে। দু'জনের আয় যখন এক জায়গাতেই জমচে, তখন দু'জনের খরচও হবে একই জায়গা থেকে। এ তো সোজা কথা! আর এই নিয়ে আজ ছ'মাস কাল ধরে', যদ্দিন লীলার বিয়ে হয়েছে—দিন নেই রাত নেই ঘ্যানোর ঘ্যানোর—ভাল লাগে না! ও-কথা ছেড়ে দাও, এইবার শোও, রাত্রি প্রায় বারটা বাজে।"

অন্য দিন হইলে তর্কে হারিলে স্ত্রীজাতি যাহা করে, জ্ঞানদাও তাহার ব্যতিক্রম করিত না; কিন্তু আজ সে যা-হয়-একটা কিছু চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাই শেষের সম্বল সেই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রটিকে এখন সম্বরণ করিয়া রাখিল।

জ্ঞানদার কথার ঝাঁজ আরও একটু তীব্র হইল। সে বলিল—"তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি কাষ। তুমি কী ক'রে জানলে যে ঠাকুরপো যা পায়, ভাল-মানুষটির মত এসে তাই তোমার হাতে তুলে দেয়। তুমি ত ভেতরকার সব কথা জান না—আমি বলি, তাও শোন'না!"

মকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে?"

জ্ঞানদা কহিল—"সবই যদি তোমারি হাতে ঢেলে দেয়, তা'হলে ছোট বউএর গলার অমন সোনার হার এলো কোত্থেকে? টুকটাক করে ছোট বউএর এটি ওটি সেটি কোত্থেকে আসে? তোমার ধনদৌলত তুমি বিলিয়ে দাওগে না কেন, আমার কী? এখন আমার কথা বড় তেতো লাগচে, কিন্তু বাসি হলে হয়ত খুব মিষ্টি লাগবে। আমি সংসারের কোনও কথা বললেই তোমার ঘ্যানোর ঘ্যানোর লাগে।"

মুকুন্দ পত্নীর অনুযোগে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকাটি জানালার কোণে রাখিয়া কহিল—"বৌমার হারের টাকা আমি দিয়েছি।" বলিয়া শুইয়া পড়িল।

জ্ঞানদার মাথাটা হঠাৎ চম্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। কি বলিল, ভাল করিয়া তাহার বোধগম্যই যেন হইল না। জ্ঞানদা একটু কাসিয়া গলাটা ঝাড়িয়া স্বামীর মুখের উপর স্থির কঠিন ভ্রুকুটি নিবদ্ধ করিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কী বল্‌লে?"

মুকুন্দ সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করিয়া পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির ভাবে যেমন ছিল তেমনি শুইয়া রহিল।

জ্ঞানদা অনেকক্ষণ কি ভাবিল—ক্ষীণ দীপালোকেও দেখা যাইতেছিল তাহার গাল ও কাণ ক্রমশঃ লাল এবং চক্ষু দু'টি স্থির, ভারী ও সজল হইতে হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইল।

মুকুন্দ ইত্যবসরে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানদা অনেকক্ষণ বসিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া, চক্ষু মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া যখন কোনও মতেই মুকুন্দকে সজাগ করিতে পারিল না, তখন পর দিনের জন্য মনে মনে ভাবী কলহের রিহার্স্যাল দিতে দিতে অগত্যা শয়ন করিল—কিন্তু নিদ্রা একেবারেই হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুকুন্দ কেশবের জ্যেষ্ঠ সহোদর; কেশব হইতে আট বৎসরের বড়। কেশবের বয়স যখন ছয় সেই সময় ইহারা মাতৃহীন হয়। পিতা বিরিঞ্চি মিত্র একাধারে পিতা ও মাতা রূপে পুত্র দু'টিকে মানুষ করিয়াছেন। কত লোকে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহে সাধাসাধি করিয়াছে, কত

বয়স্থা কন্যার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কত বুঝাইয়াছে, কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, কিন্তু তিনি সমস্তই অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছিলেন। গৃহে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না—বিরিঞ্চি নিজে রন্ধন করিয়া খাইয়া কাছারী গিয়াছেন এবং ছেলে দু'টির স্কুলের ভাত দিয়াছেন। সামান্য বেতনে ফৌজী সেরেস্তার তিনি একজন কেরাণী ছিলেন, তথাপি কুলীন কন্যার পিতার অর্থ-যৌতুকও তাঁহাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে একতিলও টলাইতে সমর্থ হয় নাই।

মুকুন্দর সতের বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া বিরিঞ্চি জ্ঞানদাকে ঘরে আনিয়াছিলেন। সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা।

মুকুন্দ বাল্যাবধিই খুব শান্ত শিষ্ট। বরিঞ্চির ইচ্ছামত সে অল্প দিনেই মোক্তারী পাশ করিয়া আদালতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। পশারও জমিল। ঘরে দু'পয়সা আসিতে সুরু হইল, জ্ঞানদা গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম চালাইতে শিখিল—কেশব কেবল পিতার এবং ভ্রাতার আদরে তাস খেলিয়া, থিয়েটার করিয়া, সভা-সমিতিতে গান করিয়া, চাঁদা আদায় করিয়া, স্বেচ্ছা-সেবক হইয়া, চুলের সজ্জা করিয়া, শিষ দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন তিন দিনের জ্বরে বিরিঞ্চিও ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন প্রভাতেই পঞ্চদশবর্ষীয় কেশব মুহ্যমান দাদার পাশে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

জ্ঞানদা ঘর দুয়ার ধুইয়া, সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার একটি কোণে বসিয়া অনবরত-উচ্চ স্বরে কাঁদিতেছে, কেশব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া চুপ করাইতে গিয়া, ভ্রাতৃজায়ার পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ

করিয়া দিল। মুকুন্দর চোখ দুইটি লাল, মাথার চুল উস্কখুস্ক, মুখখানি পাথরের মত কঠিন; কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া, একত্রিত হাঁটু দু'টিকে উভয় বাহু দিয়া বেড়িয়া বড় ঘরের রোয়াকে, দেওয়ালে ঠেস দিয়া বাড়ীর বাহিরের শিউলি গাছের মাথার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মুকুন্দর এক বৎসরের কন্যাটি ঘরে ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুকুন্দ ডাকিয়া বলিল—"মেয়ে উঠেচে যে।"

জ্ঞানদা ঘোমটা টানিতে টানিতে চোখ মুছিতে মুছিতে কন্যাকে চুপ করাইতে গেলে, মুকুন্দ কেশবকে বলিল—"কেশব এখানে আয়।"

কেশব আসিয়া দাদার পানে পিছু ফিরিয়া উঠানের দিকে সম্মুখ হইয়া পা ঝুলাইয়া চুপ করিয়া দাওয়ায় বসিল। মুকুন্দ বলিল—"আমার কাছে স'রে আয়।"

কেশব ভ্রাতার নিকট আসিয়া বসিলে, তাহার নগ্ন পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবাবিষ্ট ভাবে ভাঙা গলায় কোমল স্বরে মুকুন্দ বলিতে লাগিল—"ভাই কেশব, আমাদের সর্ব্বনাশ তো যা' হবার তাই হল। এ ভগবানের হাত—এর উপর ত আর আমাদের কোনও হাত নেই, এখন আর সে জন্যে কান্নাকাটি করলে, মাথামুড় খুঁড়লেও ত' কিছু লাভ হবে না। এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, আমাদের স্বর্গগত পিতামাতার মুখ উজ্জল করা—এবং বংশের গৌরব রক্ষা।"

কেশব নত শিরে সাশ্রুনয়নে নীরবে শুনিতেছিল। মুকুন্দ পুনরায় স্নেহগদ্‌গদ কণ্ঠে আর্ত্ত ভ্রাতাকে আশ্বাস দিয়া কহিল—"মা যাওয়া তুমি জান না, ভাই। বাবার মৃত্যুই তোমাকে একবারে পিতৃমাতৃহীন করেছে। সেজন্য তোমার কোনও দুঃখ কষ্ট আমি জীবিত থাকতে হতে দেব' না।

মনের কষ্ট অবশ্য ভগবান নিবারণ করবেন, কিন্তু যতদিন আমি থাকবো ততদিন ঘৃণাক্ষরেও সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা পারতপক্ষে তোমায় জানতে দেব' না—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

কেশব বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর কেশবের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, কেশব আর যেন সে কেশবই নয়। তাহার ঘুড়ি, লাটাই, ছিপ হইতে চুল আঁচড়াইবার আয়না চিরুণী পর্য্যন্ত একই দিনে অন্তর্ধান করিল। তাহাদের স্থানে এখন পাঠ্য পুস্তক খাতা পেনসিল আসিয়া জমিল। কেশব গ্রামসুদ্ধ লোককে অবাক করিয়া দিল। তাহার সহচারী এবং সহকারীরা শেষে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কেশবের সঙ্গই পরিত্যাগ করিল। সমবয়স্ক-দের দলে কেশবের দুর্ণাম রটিল, তবুও কেশব তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত লুপ্ত যশোরাশির পুনরুদ্ধারে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না।

কেশব বৎসর বৎসর ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিতে করিতে গিয়া প্রবেশিকা এবং তৎপরবর্ত্তী পরীক্ষায় জলপানি পাইল। সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া আজ বছর দুই উকীল হইয়া আসিয়া শ্রীপুরে নিজবাটীতে থাকিয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছে।

পিতৃবিয়োগের পর এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে মুকুন্দ কেশবের বিবাহ দিয়াছে। কেশবের তিনটি কন্যালাভও ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠা লীলার সম্প্রতি বিবাহও হইয়া গেল।

মুকুন্দর কন্যার বয়স প্রায় তেরো। আর একটি ছোট পুত্রও আছে। কন্যার রং ময়লা, মুখচোখও নাকি তেমন সুবিধার নয়, কাজেই বঙ্গের কোনও বরপক্ষেরই পছন্দ হইতেছিল না—তাই এখনও তাহার বিবাহ

হয় নাই। আশপাশ গ্রামে বরানুসন্ধান শেষ করিয়া, এখন কলিকাতা অঞ্চলে রীতিমত উৎসাহের সহিত খোজ চলিতেছে—কিন্তু তেমন সুফল ফলিতেছিল না। কন্যার গায়ের রঙ্ শুনিয়াই পাত্রপক্ষ নাকি পিছাইতেছে। কোন বরপক্ষ রৌপ্য লইয়া রূপের ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত হইলেও, কন্যাপক্ষ নির্দ্দেশমত রজতখণ্ড প্রদান করিতে অপারগ হওয়ায়, বিবাহ কেবল দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকিয়া যাইতেছে।

কিন্তু লীলা, কমলা অপেক্ষা মুখ এবং গঠনসৌন্দর্য্যে হীন হইয়াও কেবল গায়ের রঙের জোরে যে এত শীঘ্র পার হইয়া গেল, এজন্য জ্ঞানদা-সুন্দরীর মন সম্প্রতি অত্যন্ত খারাপ। কমলার বিবাহ না হইবার জন্য যে তাঁহার মনে কাঁটা বিঁধিয়া আছে তাহা নয়, কারণ সে ত নিতান্ত ছেলে মানুষ, মাত্র তেরো বৎসর বয়স; উহার অপেক্ষা কুলীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরে অনেক বড় বড় মেয়েরও বিবাহ হয় না. কিন্তু লীলার বিবাহ হইল কেন? দৃষ্টিশক্তিহীন পাত্রপক্ষীয়েরা কী দেখিয়া অমন কুৎসিত কন্যাকে বধু করিয়া গৃহে লইয়া গেল? বরপক্ষীয়দের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের একান্ত অভাব. পাত্রী-নির্ব্বাচনে চূড়ান্ত মূঢ়তা এবং বিধাতার এবম্বিধ পক্ষপাতিতাই জ্ঞানদার চিত্তকে বিগত কয়েক মাস হইতে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম প্রথম জ্ঞানদা সাধ্যমত তাহার এই মনোভাব গোপনই করিত, কারণ তাহার স্বামী লোকটি বড় ভাল নয়, এক বারে বোকা! ভাই পাশ-করা উকীল এবং ভ্রাতৃবধু ধনী-কন্যা বলিয়া, তিনি কেবলি তাঁহাদের তোবামোদ করেন এবং আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই।

পত্নীকে আদর যত্ন ত নাই বলিলেই হয়। অথচ ভ্রাতৃবধুকে গোপনে

যে হার গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাই আজ বড় বধুর চিত্ত-বেদনাকে একেবারে অসহ্য করিয়া তুলিল।

জ্ঞানদার প্রতিহিংসাপরায়ণ মন তাই ছোট বউএর নানা ত্রুটি ধরিয়া ফিরিতে লাগিল।

জ্ঞানদা বড় বধু, গৃহের কর্ত্রী, বাল্যকাল হইতে কেশবকে মানুষ করিয়া, একা এই গুরুভার সংসারটিকে ঠেকাইয়া রাখিয়া তিনি যে দেবরদম্পতির অনন্যসাধারণ উপকার করিয়াছেন, এবং তিনি যে তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থেই উহাদের এ যাবৎ গ্রাসাচ্ছাদনের এবং কন্যাদায়মোচন প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করিতেছেন—এই কথাগুলি নিরন্তর কারণে অকারণে কেশব এবং তাহার পত্নীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দিয়া, ইহার মাধুর্য্যটুকু বিষতিক্ত করিয়া তুলিলেন। কেশব এ বিষয়ে সতত সজাগ এবং নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ—কথাগুলি ততটা গায়ে তুলে না, কিন্তু ছোট বউ স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ সত্ত্বেও নাকি দিবারাত্রি এত খোঁটা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, সময়ে সময়ে দুই চারিটি যথাযথ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ এবম্বিধ উত্তর প্রত্যুত্তর, মন্দ লোক যাহাকে কলহ বলে, তাহাতেই পরিণত হইল। দৈনিক দুই বেলা, কখন কখনও ততোধিক বার পর্য্যন্ত এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল!

আইনজীবী ভ্রাতৃযুগল অনাত্মীয় কত লোকের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া, শান্তি স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই নিতান্ত আত্মীয় দুইটির বিবাদ মিটাইতে বা নিজেদের গৃহে শান্তিস্থাপনা করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ আর পাক হয় নাই। ইহা তিথি-বিশেষে প্রতিপাল্য শাস্ত্রীয় অরন্ধন নহে—ইহা মিত্র-পরিবারের আধুনিক একটি বিশেষত্ব। •

মাসের প্রথম পনের দিন বড় বধূ, শেষার্দ্ধ ছোট বধুর রাঁধিবার পালা! ইদানীং বড় বউ আপনার পালায় প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন, ছোট বউ চালাইয়া লয়। মনে মনে তাহার এরূপ একটিনী করিবার আপত্তি থাকিলেও, কার্য্যত তাহা প্রকাশ পাইত না, বা মৌখিক কোনও রূপ ওজরও এ পর্য্যন্ত সে করে নাই।

এখন ছোট বধুরই রাঁধিবার সময়। গত রাত্রি হইতে তাহার অল্প জ্বর হইয়াছে, পূর্ব্ব হইতে সর্দ্দি কাসিও ছিল। ঝি কাযকর্ম্ম, করিয়া দিয়া, তরকারী কুটিয়া, রান্নার সমস্ত জোগাড় করিয়া, উনানে কয়লা দিয়া, কেশবের ঘরের দুয়ারে গিয়া ডাকিল—"ছোট মা, এস গো, আঁচ ধরেছে যে—"

ছোট বউ কাপড় ছাড়িতেছিল—ধরা গলায় কাঁপা-সুরে উত্তর দিল "যাচ্ছি, যাচ্ছি। মরণ হয় তো বাঁচি।"

ছোট বউ একখানা লাল সিল্কের লতাপাতা কাটা পাড়ওয়ালা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বড্ড বেলা হয়ে গেল যে—ঝি, তুমি এখন আর যেয়োনা, বড্‌ঠাকুরকে আগে কাছারী পাঠাই—তারপর তুমি যেয়ো। যা' হয় দুটো সেদ্ধ পক্কো আজ এ-বেলার মত হোক ত'—তার পর দেখা যাবে।"

ঝি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিল—"জ্বর এসেচে নাকি, ছোট মা ? তা' হলে অমন কাঁপতে কাঁপতে আজ নাই বা রাঁধলে ? তুমি শোও, আমি বড়মাকে বল্‌চি গিয়ে।" বলিয়া দাসী গমনোদ্যত হইলে, ছোট বউ তাহাকে ফিরাইয়া কহিল—"না, না, ও ঝি, আমি বেশ পারবো, দিদিকে আর কষ্ট দেবার দরকার নেই—দিদি ছেলেগুলোকে দেখবেন'খন্। ও-বেলায় যদি জ্বর না ছাড়ে, তা'হলে ত ওঁকেই সব করতে হবে,—তখন এ-বেলা থেকে আর কেন ?"

ঝি জানিত, তাহার অনুরোধের কি ফল হইবে, সুতরাং আর পীড়াপীড়ি করিল না। ছোট বউ ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া, দিল !

পত্নীর জ্বর কেমন, জানিতে কেশব বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, ছোট বউ মুগের ডাল সিদ্ধ করিতে দিবে বলিয়া পুঁটুলি বাঁধিতেছে ! কেশব রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"তোমার জ্বর ছেড়েছে ? কাসছো যে এখনও খক্ খক্ করে ?"

ছোট বউ মুখ না তুলিয়া পুঁটুলিটি ভাতের হাঁড়িতে ফেলিয়া দিয়া, হাতা দিয়া নাড়িয়া দিতে দিতে কহিল—"না, জ্বর আর ছেড়েছে কই—বরং রাত্তিরের চেয়ে একটু বেড়েইছে।"

"তবে তুমি রাঁধতে এলে কেন ? বড় বৌকে বললেই ত হ'তো—আজকের মত তিনিই চালিয়ে নিতেন।"

ছোট বউ স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে সকাতরে কহিল—"তাঁকে বল্‌তে গিয়ে এই তিন সকালে আবার একটা ফ্যাসাদ বাধাই—আর তুমি এসে আমায় গালাগালি কর'। তা'তে কায কি ?

যতক্ষণ একেবারে না পড়ছি, ততক্ষণ চালিয়ে দিই—তার পর আমি মুষড়ে পড়লে, নিজেই তোমরা যা হয় করবে।”

কেশব বলিল—“এতে আর ঝগড়া গণ্ডগোলের কথা কী আছে? বড়বউএর পালার সময় তাঁর শরীর খারাপ থাকলে তুমি যেমন চালাও—তোমার শরীর খারাপ হ'লে তিনিও তেমনি চালাবেন। এতো চাকরী নয়, নিজের বাড়ীতে নিজেদের স্বামীপুত্রদের রেঁধে খাওয়ান, এতে আর এত পালাপালিরই বা কী আছে? আমার বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—অকারণ ভুগে, খরচ-খরচান্ত হবার দ...র কী?”

ছোট বউ এ কথার আর উত্তর দিল না—আলু ও পটল যাহা কোটা আছে তাহাতে হলুদ মাখাইয়া লবণ আনিতে ভাঁড়ার ঘরে গেল। কেশব জ্ঞানদার ঘরে আসিয়া দেখিল যে, ছোট ছেলে গোবিন্দ মেঝেয় বসিয়া হালুয়া খাইতেছে ও বড় বধূ অঙ্গনমুখী বন্ধ জানালার পাশে মুখ রাখিয়া শয্যায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে

কেশব বলিল—“বড়বৌ আজ না হয় তুমিই এ বেলাটা রান্নাটা করে নিতে, ওর খুব জ্বর। জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে রান্না চড়িয়েছে। ও-বেলা না হয় একটা বামুন টামুন দেখে আনা যাবে।”

জ্ঞানদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না। কেশব শয্যার কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় কহিল—“বড় বৌ, ও বড় বৌ—বলি, কথা শুনছ? আচ্ছা, শোন, আর একটা পরামর্শ তোমার চাই। তোমরা তো চিরদিন দু'বেলা হেঁসেল ঠেলছ—একটা বামুনই যদি রাখা যায়, ক্ষতি কি? কতই বা আর খরচ! তোমাদের শরীরও তো আর তেমন ভাল নয়,

'আর কদ্দিনই বা মানুষের শরীর এমন হাড়ভাঙা খাটুনীতে ভাল থাকে? কি বল', বড় বৌ?"

জ্ঞানদা যেমন কেশবের পানে পিছু ফিরিয়া বসিয়াছিল, তেমনি থাকিয়াই মুখটি ঈষৎ ফিরাইয়া কেশবকে উদাসীনভাবে কহিল—"আমাকে, আর ঠাট্টা করা কেন ভাই? বামুন রাখবে কি আর পাঁচটা চাকর চাকরাণী বাড়াবে, তার পরামর্শ আমার সঙ্গে কেন? সে সব ছোট বউ আর তোমার দাদার সঙ্গে করলেই তো বেশ হয়। আমি কে? আমি একটা বাড়ীর ঝি বই তো নয়! তবে রান্নার কথা যে বলছ—আজ আর আমার দ্বারা হয় না, আমার মাথাটা এত ভার যে মাথা তুলতে পারছি না—মাথার টনটনানিতে মনে হচ্ছে যেন মাথাটা খসে পড়ল।"

জ্ঞানদার কথাগুলিতে কেশব যুগপৎ ব্যথিত ও চিন্তিত হইল। কেশব বলিল—"সেই তেলটা আনি, মাথায় ও রগে মিনিট দশেক মালিশ করলেই, মাথা ভাল হয়ে যাবে।"

জ্ঞানদা বাধা দিয়া বলিল—"না, না, এখন না—এখন আর সে তেল মালিশ করার আমার সময় হবে না।"

কেশব শুনিল না—তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া একটা তেলের শিশি হাতে করিয়া ফিরিল। খানিকটা তেল হাতে ঢালিয়া, সে বিছানার উপর বসিয়া জ্ঞানদার মাথার কাপড়টি টানিয়া ফেলিয়া, তাহার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া তৈল-সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

মিনিট দুই পরেই জ্ঞানদা কেশবের হাত সরাইয়া দিয়া, মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা হয়েছে, এইবার ছেড়ে দাও। কেন আমার জন্য অত করছ?"

কেশব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল—"কেন বড় বউ, তুমি এমন কষ্ট দিচ্ছ? আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি? আমাকে তুমি ছোট ভাইটির মত আজ পনের বৎসর মানুষ করে আসছ। আমি মাকে চিনি না, বাবাকে চিনিনা—চিনি কেবল তোমাকে আর দাদাকে। আর তুমি বল—"আমি কে?" তুমি যে আমার শুধু ভাইয়ের স্ত্রী নও—তুমি যে আমার মা, আমার বোন—এ কথা আমি তোমায় কী করে বুঝাই?"

জ্ঞানদা পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকিয়াই ঈষৎ গ্রীবাআন্দোলন করিয়া বলিল—"হাঁ, তা ছিলাম, যখন তুমি ছোট ছিলে, বউ হয়নি। এখন আর আমি কে ভাই? এখন তুমি উকীল, বউ এসেছে,—বউ বড়লোকের মেয়ে, তাতে সুন্দরী! আমাদের মত এমন হাড়হাবাতে কুচ্ছিৎ লোককে তোমরা আর মানবে কেন?"

কেশবের অন্তরে একটা দারুণ ব্যথা জাগিয়া উঠিলেও সে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—"বড় বউ তুমি একেবারে পাগল হয়েছ! এই সব পাগলামী বুঝি তুমি দিনরাত চিন্তা কর বসে বসে?"

কথাটা বড় বউয়ের ততটা মনঃপুত হইল না। সে কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিল—"হাঁ, আমার তো আর কোন কায নেই—তাই দিবারাত্তির কেবল বসে বসে আমি কথার সিজ্জন করি!" বলিয়াই অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

কেশব জানে, বড় বউ চিরদিনই বড় অভিমানিনী; তদুপরি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই সে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিল। ভাবিল—কী করিতে আসিয়া কী করিয়া বসিলাম। এখন পলাইতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু সে

গলায় কি করিয়া? তাই নিতান্ত আর্ত্তভাবে করজোড়ে নিবেদন করিল—"বড় বউ, তুমি ব্যথা পাবে এমন কথা তো আমি কিছুই বলিনি।"

জ্ঞানদা বলিতে লাগিল—"আমার কপালে আর সুখ কোথা? যেদিন থেকে এ বাড়ীতে ঢুকেছি, সেই দিন থেকেই তো আমার ঘাড়ে জোয়াল পড়েছে। তা এততেও কপালে যশ পাইনে। আমার অসুখ বিসুখ হ'লে সেটা যেন কিছুই নয়! তুমি বলছ বটে ঠাকুরপো—কিন্তু বল' দিকিন ছোট বউএর অসুখ হয়েছে, তাকে আরাম করতে পাঠিয়ে আমায় কোন মুখে হেঁসেলে যেতে বললে? আর বামুন-চাকর রাখার কথা তো তোমার এদ্দিন মনে হয়নি। আজ ছোট বউ জ্বর গায়ে, লোক দেখিয়ে, ভাল মানুষ সেজে রাঁধতে গিয়েছে কি না, তাই অমনি তোমার আঁতে ঘা লেগেছে। কৈ আমি যখন জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে কায করিছি, তখন তো এ কথা কেউ বল'নি।"

কেশব কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদোদগম হইতে লাগিল, গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"বড় বউ আমার অপরাধ ক্ষমা কর' আমি জানতাম না যে, তোমার অসুখ করেছে। দোহাই বড় বউ"—বলিয়া কেশব জ্ঞানদার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল।

যে স্ত্রীলোক বিনা অছিলায় কলহে কৃতনিশ্চয়, তাহার কাছে নরম হইলে, চিরকাল যে ফল হয়, তাহাই ঘটিল। জ্ঞানদা সবলে পা টানিয়া লইয়া অশ্রুসজল নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ স্বরে বলিতে লাগিল—"ছাড়,' পা ছাড়' আর মায়া-কান্না কেঁদে তোমার মাপ চেয়ে কায নেই। তুমি তো আর ছোট খোকাটি নও, যে

কিছুই জান না। কথা বলতে গেলে, অনেক কথাই বলতে হয়, মনে করি কিছু বলব না, কিন্তু বাড়ীতে থাকতে হলে না বল্লেও চলে না! এই মাত্র তুমি ছোট বউর কাছে কি বলছিলে বল দেখি ?”

কেশব হতভম্ব। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত গুলাইয়া গিয়াছে। সে গভীরতর আশঙ্কিত হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—“কী বলেছি বড় বউ ? আমি ত অন্যায় কোন কথা বলেছি বলে মনে হচ্ছে না।”

জ্ঞানদা ঝাঁজের সহিত উচ্চস্বরে বলিল—“বল নি ? মিছে কথা বলচ কাকে ? আমি সে সব নিজের কাণে শুনেছি। বলছিলে না তুমি, যে ওর ছেলে আছে, ওর স্বামী আছে ওই রাঁধবে, কেন রাঁধবে না ? আমার ঐ একটা ছেলে—তোমাদের বাপপিতাম’র বংশ—ওটারও তোমরা হিংসে কর ? ওইতো একটা পোকা, ওটাতে ও তোমাদের বুক চড়চড় করচে ? এই হিংসের জন্যেই তো তোমাদের ছেলে হচ্ছে না। ছোট বউ অমনি যখন তখন আমায় ছেলের খোটা দেয়। যে ভাসুরের মুখে ছোট বৌএর সুখ্যাত ধরে না—লুকিয়ে লুকিয়ে হার পর্য্যন্ত গড়িয়ে দেয়—তারই ছেলের হিংসে ? ছিঃ, ছিঃ—তোমাদের নরকেও স্থান হবে না!” বলিয়া জ্ঞানদা উচৈচস্বরে কাঁদিতে বসিয়া গেল। কেশবের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল—সে কোনও কথা না বলিয়া দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ছোট বউ রন্ধন করিতে করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রান্নাঘরের মেঝেয় শুইয়া পড়িয়াছিল, জ্বরের প্রকোপ ক্রমশ বাড়িতেছিল —হাঁড়ির ভাত ধরিয়া বাড়ীময় একটা দুর্গন্ধ উঠিয়াছিল। গোবিন্দ ইত্যবসরে অবাধে সুপ্তা কাকীমার স্তন পানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মাতার

ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সে খুড়ীমাকে উঠাইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল —"খুলী মা, ও খুলী মা, কাকা মাকে মাচ্চে—মা কান্‌চে।"

জ্ঞানদার সরোদন বিলাপোক্তি বহির্ব্বাটীতে মুকুন্দর কাণে পৌছিতেই মুকুন্দ ধীরে ধীরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই—গোবিন্দ দৌড়িয়া আসিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—"বাবা, বাবা, মা কান্‌চে—কাকা মাকে মেলেচে।"

কেশব দ্রুতপদে মুকুন্দর কাছে আসিয়া গোবিন্দকে বুকে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিল। কেশবের সজল গম্ভীর মুখ দেখিয়া মুকুন্দ কেশবের পিঠে হাত দিয়া "এস বাইরে এস, ব্যাপার কী?" বলিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কেশবের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনিয়া মুকুন্দ কিয়ৎকাল গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশ তাহার ললাটের রেখাগুলি স্পষ্ট ও স্ফুটতর হইয়া উঠিল, মুখখানা ঝড়ের পূর্ব্বে মেঘের মত নিবিড় কালো হইয়া উঠিল। কেশব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, হঠাৎ দাদার মুখভাব দেখিয়া, সশঙ্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, কী ভাবছেন?"

মুকুন্দ গম্ভীর ভাবে কহিল—

"হুঁ—বল্‌চি।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া থাকিবার পর মুকুন্দ বলিল—"দেখ কেশব—"

"আজ্ঞে—"কেশব কথা কহিয়া বাঁচিল।

"আমি কয়েক মাস হ'তেই চিন্তা করে দেখছি, আমাদের আর একত্রে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।"

কেশবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে কী উত্তর দিবে ঠাওরাইতে পারিল না! মুকুন্দ বলিতে লাগিল—"অবিশ্যি আমার এ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু—আর তা না করেও কোনো উপায়ান্তর দেখছি নে। বাড়ীতে রোজ এই কুকুরকেলেঙ্কারী—সামান্য ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করে, এই যে দিবারাত্র কুরুক্ষেত্র—এতো আর বরদাস্ত হয় না। বোধ হয় ডোম-চাঁড়ালের ঘরেও এমন হয় না, কী বল ?"

কেশব নীরব। মুকুন্দ বলিতে লাগিল—

"প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম—তুমিও তাই বলেছিলে, যে এটা সাময়িক, হু'দিনেই থেমে যাবে ; কিন্তু এখন দেখছি, এ তা নয়।—অতএব আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়! নিজ নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে অবশ্য কেউই আমরা পরিত্যাগ করতে পারব না। অথচ দিনরাত্তির তাদের মুখে লাগাম ধরে' থাকাও সম্ভব নয়—কাজেই বৌ দুটোকে পৃথক্ করে দেওয়াই আমি ঠিক করলাম"।

কেশব সজলকাতর দৃষ্টিতে একবার মুকুন্দর মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল, যেন কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না।

মুকুন্দ ভাইকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"ও কি, কাঁদছ কেন ভাই ? তুমি কি ভাবছ আমি তোমাদের উপর রাগ করে, তোমাদের পৃথক করে দিচ্ছি ? আরে রাম, রাম—আমার উদ্দেশ্যটা বেশ করে বোঝ' আগে। আমি বিলক্ষণ জানি, আমাদের সাংসারিক অশান্তির মূলে বড় বৌ। সে হ'ল বাড়ীর গিন্নী, আমিই যখন পারি না—তোমরা

তখন তো পার্‌বেই না—সব সময় তার প্রতিবাদ করাও তোমাদের উচিত নয়, শোভনও নয়। আমার পক্ষেও এ বয়সে ও রকম কোঁদল করা সম্ভব হবে না, আর ও কায করার মত শক্তিও আমার নেই। তাই সব দিক বজায় রাখবার জন্যে আমাদের ভিন্ন হওয়াই উচিত। তুমি এটা মনে করো না যে, তোমাতে আমাতে ভিন্ন হচ্ছি। আমরা যেমন আছি, ঈশ্বর করুন, যেন এমনিই চিরজীবন থাকতে পারি!—আর হাঁ, তোমার এখনও স্বাধীনভাবে সংসার চালাবার ক্ষমতা হয় নাই; তা আমি বিলক্ষণ জানি—তোমার যা কিছু দরকার হবে, সব আমার কাছেই পাবে: সেজন্যে তুমি কোন চিন্তা করো না!"

মুকুন্দ গম্ভীরভাবে অথচ স্নেহ-করুণ স্বরে এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলিয়া গেল যে, কেশব কোনও কথার উত্তর বা প্রতিবাদ করিতে একটু ফাঁক পাইল না। কথা শেষ হইলে মুকুন্দ যখন সজোরে কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের কাছে টানিয়া লইল, কেশব তখন শিশুর মত দর-বিগলিত ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার বুকে মুখ লুকাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীপুরের মিত্তিরদের বাড়ীর চেহারা পর্য্যন্ত অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। বাড়ীর উঠানে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর উঠিয়া একখানি বাড়ীকে দুইখানি করিয়াছে, একটি সদর দরজার স্থানে দুইটি দরজা বসিয়াছে, একটি খিড়কির জায়গায় দুইটি হইয়াছে। মুকুন্দ এখন মহকুমা আদালতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্তার। কেশবেরও পশার বেশ জমিতেছে। মুকুন্দর কন্যা কমলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দ

একটু বড় হইয়াছে—সে এখন স্পষ্টই খুড়ীমা বলিতে পারে। খুড়ীমার কাছেই সারাদিন থাকে, সেই খানেই খায়, সেই খানেই শোয়।

জ্ঞানদা প্রথম প্রথম ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত, আপত্তি করিত, সময় সময় স্বামীদেবরের অনুপস্থিতে দ্বিপ্রহরে চীৎকার করিয়া ছোট বউকে শুনাইয়া শুনাইয়া দু'একটা কঠিন কথাও বলিত! কিন্তু স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া ছোট বউ সেগুলি নীরবেই সহ্য করিত। কখনও কখনও—খিড়কীঘাটে অথবা ঠাকুরবাড়ীতে কিম্বা ষষ্ঠিতলায়—দুই জায়ে সাক্ষাৎ হয়, অপরিচিতের মত দুই জনই দুজনকে এড়াইয়া চলে।

জ্ঞানদার বড় ভাই বীরেন্দ্র আসিয়াছে, ভগিনীপতি ও ভগিনীকে ছোট ভাই নরেন্দ্রর বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে।

আফিস ঘর হইতে অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়া রন্ধন-তৎপরা জ্ঞানদাকে ডাকিয়া মুকুন্দ বলিল—"ওগো বল্‌তে ভূলে গিয়েছিলাম, এ বেলা আমার নেমন্তন্ন আছে, সেখান থেকে খেয়ে কাছারী যাব।"

জ্ঞানদা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"সেকি, আজ পাচ রকম রান্না বান্না হচ্ছে, তুমি খাবে না, কি রকম?"

মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"পাঁচ রকম রান্নাবান্না হচ্ছে, ব্যাপার কী"?

জ্ঞানদা উত্তর দিল—"পাচ রকম না কর্‌লে কি চলে? কত ভাগ্যে দাদা এসেচেন। তোমার বাড়ীতে আর ত কখন তিনি আসেননি—আদর যত্ন একটু করবে না?"

"ও তা বটে, তা বটে!" বলিয়া হাসিয়া কহিল—"তা ত আগে জানতাম না, আচ্ছা—ও বেলাতেই খাওয়া যাবে, এ বেলা যখন নেমন্তন্ন স্বীকার করেছি—।" জ্ঞানদা কিন্তু বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল!

রাত্রে জ্ঞানদা বলিল যে ২৬শে শ্রাবন নরেনের বিবাহ, তাহাকে আগামী পরশ্বই দাদার সঙ্গে যাইতে হইবে। মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যেন নিশ্চিত যাওয়া হয়; আর বিশেষত এই যখন বাড়ীব আপাতত শেষ কাজ।

জ্ঞানদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"দিন আষ্টেক দশ কি আর চল্‌বে না? তুমি ত একাই—তা—তা ঐ ওর নাম কি—ধর—ছোট বউএর কাছেই খেলে!" শেষের কথা কয়টি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় জ্ঞানদা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মুকুন্দ হতাশভাবে বলিল—"তা কি হয়, বড় বৌ? কোন মুখে আমি তাদের আজ একথা বল্‌তে যাব?"

জ্ঞানদার মুখটা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল, একটু উগ্রভাবেই বলিল—"তা হবেই বা না কেন? আমি গেলেই ত ওরা বুঝবে? এটুকু উপকার আর ওরা কর্‌বে না? তুমি ওদের জন্যে এত কর। ছোট বউএর প্রশংসা তোমার মুখে ধরে না! ছোট বউএর মত ভাল বউ নাকি ভূভারতে আর দুটি নেই!"

"হাঁ—যা বলছ' তা ঠিক বটে। তবে কি না কথা হচ্ছে যে, আমি এখন কী করে ওদের বলব আমি তোমাদের বাড়ীতে ৮।১০ দিন খাব—আমাকে খেতে ওরা দেবে, তবে যাদের আমি আলাদা করে দিয়েছি, আজ আবার তাদের বাড়ী খেতে যাই কি বলে?—এটা আর তুমি বুঝতে পার্‌ছ না?"

জ্ঞানদা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মুকুন্দ বলিয়া উঠিল—"না, তোমার এখন যাওয়া হবে না! আমি তোমার দাদাকে সব বুঝিয়ে বলে দেব।"

জ্ঞানদা অস্বাভাবিক উষ্ণতার সহিত বলিয়া উঠিল,—“তা কি হয়? আমার না গেলে চলবে না। কত আদরের এই ছোট ভাইটি—এর বিয়ে হয়ে গেলেই বাড়ীর কাজকর্ম্ম ও আপাতত শেষ হয়ে যাবে—এর বিয়েতে না গেলে কি চলে? মা কত করে বলে দিয়েছেন—আমাকে পশু যেতেই হবে। এতে অমত কর্লে চলবে না, আমার কত আদরের ছোট ভাই!”

মুকুন্দ বলিল—“যাবে বলে তো লাফাচ্ছ, কিন্তু এখানে কে দেখবে সে কথা ত একটিবারও ভাবছ না? ভাইয়ের বিয়ে হবে, বেশ তো—এখান থেকে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দাও—তুমি না গেলে কি আর বিয়ে হবে না?”

জ্ঞানদা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল—“আমি না গেলে কি আর বিয়ে আটক থাকবে? তা’ নয় তবে কত দিন নরেনকে দেখিনি—তার বিয়ে—” বলিতে বলিতে জ্ঞানদার গণ্ড প্লাবিত করিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মুকুন্দ বলিল—“আচ্ছা, অন্য সময় গেলেই তো হবে। এখন গেলে চলবে কেমন করে।”

জ্ঞানদা মুকুন্দর পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে কহিল—“ওগো, দোহাই তোমার—তোমার দুটি পায়ে পড়ি একবারটি আমায় যেতে দাও। জানই তো নরেন্ আমার হাতে মানুষ-করা, কোলে-পিঠে করা,—ওর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে। ওর বিয়েতে যদি না যাই তো সে মনে বড্ড দুঃখ করবে—এ আমি সহ্য করতে পারবো না! দোহাই তোমার।”

মুকুন্দ তবুও আপত্তি করিতে লাগিল। জ্ঞানদা বলিল—"না যেতে দিলে আমি গলায় দড়ি দেব তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। তা হলেই কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে?"

ইহার পর মুকুন্দ আর কোন আপত্তি করিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয়-হয়। বহির্ব্বাটীর বারান্দায় মুকুন্দ ও কেশব বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—নালির জলে গোবিন্দ কাগজের নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিতেছে। গোবিন্দ জননীর সঙ্গে মামার বিবাহে মাতুলালয়ে গিয়াছিল, কিন্তু খুড়ীমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই বলিয়া, একজন ভৃত্যের সহিত পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছে।

সম্মুখে পর্দ্দাফেলা একখানি ছইওয়ালা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ানের পশ্চাতে উপবিষ্ট ভৃত্য তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া মুকুন্দ ও কেশবকে প্রণাম করিল। তাহার পর একটি দাসী নামিল, সন্দেশের হাঁড়ি, কাপড়ের একটা পুঁটুলি, কাপড়-ঢাকা একটা ধামা এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞানদাসুন্দরীর অবতরণ ঘটিল। গোবিন্দ লাফাইয়া আসিয়া গাড়ীর কাছে পূর্ব্বেই দাঁড়াইয়াছিল। জ্ঞানদা নামিয়াই গোবিন্দকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

মুকুন্দ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এত দেরী হল যে আসতে?"

জ্ঞানদা থামিল। হাসিয়া কহিল—"জলটার জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল কি না, তাই দেরী হলো।"

দুয়ারের কাছে আসিয়াই জ্ঞানদা থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—“এ কি ?”

মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল—কী ?”

জ্ঞানদা বলিল—“আমাদের সদর দরজা কৈ ?”

মুকুন্দ বলিল—“ও, তাই খুঁজ্‌ছ ? সে সব বদ্‌লে দিয়েছি যে—” বলিয়া থামিল।

জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি রকম ?”

মুকুন্দ বলিল—“বাড়ীর ভেতর চল সব বুঝতে পারবে।”

জ্ঞানদা দেখিল, দুই ভাইকে দুই ভাগ করিয়া প্রাঙ্গনে যে প্রাচীরটা ছিল, সেটার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। জ্ঞানদার মুখ ছোট হইয়া গেল, গলা শুকাইয়া উঠিল, সমস্ত মন নিদারুণ তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। কহিল—“এর মানে ?”

গোবিন্দ মাতার ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল।

মুকুন্দ কহিল—“এর মানে তো খুবই সোজা। দশ দিন আগে তো তুমিই বলেছিলে যে নরেন তোমার কোলে পিঠে মানুষ করা ছোট ভাইটি। তার বিয়েতে না যেতে পেলে তুমি গলায় দড়ি দিতেও চেয়েছিল। কেশবও ত আমার তেমনি ভাই! তাকে ভিন্ন করে, যে করে এই তিন বছর আমার কেটেছে, তা ভগবানই জানেন। তোমার নরেন যা, কেশবও যে আমার তাই!”

জ্ঞানদা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল! ছোট বউ আসিয়া প্রণাম করিয়া, “এস দিদি” বলিয়া জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

পুনর্ম্মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন বাবু যখন ডেপুটী ছিলেন, তখন তাঁহার মত "অহিন্দু" কেহই ছিল না। হিন্দুদের নিষেধ ত মানিতেনই না, মুসলমানেরাও তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইত। হিন্দুধর্ম্মের উপর এরূপ বিদ্রোহাচরণ তিনি প্রকাশ্যেই করিতেন। এখন পেন্সন লইয়া স্বগ্রামে আসিয়া অবধি হঠাৎ হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার অতি-মাত্রায় ভক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। তখন যতটা অশ্রদ্ধা ছিল, এখন ততটা কি—তদপেক্ষা অনেক বেশী শ্রদ্ধার ভাব হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার হইয়াছে। জুতার সঙ্গে পেঁয়াজ পর্য্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; শেষোক্ত পদার্থটির বাড়ীতে 'প্রবেশ নিষেধ'। এখন গ্রামের ভট্টাচার্য্য, টোলের পণ্ডিত, ঠাকুর-বাড়ীর পূজারীদের সঙ্গে নগেনবাবুর সদাসর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ হয়। ইহারা এক-দিন নগেনবাবুর এত চক্ষুশূল ছিলেন যে, ইহাদিগকে মানুষ ভাবিতেও তিনি সন্দিহান হইতেন। কিন্তু এখন তাঁহার এমন মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সেই লোকগুলিই এখন তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাম্য-বালকেরা এজন্য নানারূপ হাসিতামাসা করিত; প্রবীণেরা হুঁকা টানিতে টানিতে তাঁহাদের জ্যোতিষিক গণনা অভ্রান্ত দেখাইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিকে ঠেলিয়া গম্ভীরভাবে শিরশ্চালনা করিতে করিতে বলিতেন, "দেখ, আমি কত দিন আগে বলেছি; এ ত হ'তেই হবে।" গ্রামের মেয়েরা

পথে ঘাটে বলাবলি করিত যে, বাবা বৈদ্যনাথের স্বপ্নাদেশে নাকি নগেনবাবুর ধর্ম্মজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছে। যে যাহাই বলুক না কেন, গ্রামের এবং আশ-পাশ দশ ক্রোশ দূরের লোকেও নগেনবাবুকে যে একটি মহাপুরুষ ভাবিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সকলের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এমনি হাকিমী করিয়া আসিয়াছেন যে, এখন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন বলিয়া সরকারে যেমন জানাইলেন, অমনি কোম্পানি বলিলেন, "বেশ যাও—কিন্তু তোমাকে মাসিক তিন শত টাকা খোরাকী লইতেই হইবে।" যে কোম্পানী সকলের কাছ হইতে কেবল লইয়াই থাকে, সেই কোম্পানীই ঘরে বসাইয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে মাসিক তিন শতখানি মুদ্রা প্রদান করিতেছে! আর যখন তিনি সদরে একবার হাকিম ছিলেন, গ্রামের দীনুবাগ্দী, হরি ভট্‌চাজ, কানাই ময়রা, নন্দ তেলী সাক্ষী দিতে গিয়া স্বচক্ষে সকলে দেখিয়া আসিয়াছে, কত বড় বড় সব সাহেবেরা তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করে এবং টুপি খুলিয়া সেলাম দেয়। কাযেই চৌধুরী মহাশয় কি যে-সে লোক? এ সকল ত দেখা। ইহা ছাড়াও তিনি নিজ মুখে কত কথা বলিয়াছেন—তেমন আর কেউ কখন পারে ত' নাই—পারিবেও না। এইরূপ নানা কারণে দুই বৎসরের মধ্যেই নগেনবাবু দেশে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন।

গৃহিণী চিরদিনই স্বামীর নিকট হইতে একটু তফাতে থাকিতেন, এখনও আছেন। কারণ আতপ-চাউল ও কদলীসিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার ভরসা হয় না। মৎস্য-প্রিয়তাই এরূপ বিশ্বাসের হেতু। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহিণী বলিতেন, যেমন

চিরদিন করে আসছি তেমনি করাই ভাল। আমার ধর্ম্ম উনি, আমা কর্ম্ম কিরু ও কানুর পরিচর্য্যা।”

কিরু ও কানু যথাক্রমে কীর্ত্তিকুমার ও কান্তিকুমার, দুইটি পুত্র। কীর্ত্তির আগে উপর্য্যুপরি চারিটি সন্তান মরিয়া যাওয়ায় কীর্ত্তিকুমার মায়ের কিছু বেশী আদরের। কীর্ত্তি কলিকাতায় থাকে, বি.এ, পড়ে, বয়স বাইস বৎসর! কীর্ত্তির পর আরও দুইটি সন্তান মহাকালকে দিয়া কান্তি। কান্তি কীর্ত্তির চেয়ে আট বৎসরের ছোট। সে গ্রামের এক ক্রোশ দূরে—নবগ্রামে যে এন্‌ট্রান্স স্কুল আছে, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মঙ্গলগ্রাম হইতে প্রত্যহ গাড়ীতে যায় এবং গাড়ীতে আসে। আর হিরণ আট বৎসরের একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে—এখনও তার বিবাহ হয় নাই।

মঙ্গলগ্রামের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ। জমিদারীও অল্প নয়—নগেনবাবু এবং তাঁহার পুত্রেরাই ইহার একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনও অনেক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে—এই আন্দোলন যখন ঘনাইয়া উঠিল, তখনকার এই তুমুল বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কীর্ত্তিকুমার হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। কথাটা কিছুদিন গোপন রাখিল! কিন্তু পূজার সময় নগেনবাবু যখন বার বার কীর্ত্তিকে বাটী আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন আর গোপন থাকিল না—

প্রকাশ করিতে হইল। কীর্ত্তি পিতাকে লিখিল যে—"সে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, যদি তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে যাইতে পারে।"

পত্র পড়িয়া নগেনবাবু একবারে বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সদাপ্রফুল্ল হাস্যময়ী গৃহিণী মূর্চ্ছিত হইলেন; বাটীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

গ্রামে নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। সকলেই এ ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় কি করেন, দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রহিল। অনেকে জাতিপাত আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িল যে, চৌধুরী মহাশয় ছেলেকে ত ঘরে আনিবেনই। জমিদার যদি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি উপায়ে তাহারা জাতি রক্ষা করিবে? কেহ কেহ এক একবার মনে করিল যে, নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে। কল্পনা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—একে জমিদার তাহাতে হাকিম। গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা হঠাৎ আত্মীয়-গৃহে বিশেষ কার্য্যে যাইতে লাগিল। যাহারা রহিল, তাহাদের কেবল এক চিন্তা—জাতিরক্ষা সমস্যার সমাধান। মোড়লদের দাওয়ায়, আচার্য্যদের বৈঠকখানায়, তামুলিদের গদিতে, চন্দ্র মুদীর দোকানে, সর্ব্বত্রই বৈঠক—জমিদার না চটে অথচ জাতি রক্ষা হয়! সর্প বিনষ্ট হয়, অথচ যষ্ঠি অটুট থাকে!

নগেনবাবু কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী শয্যা লইয়াছেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি অবিরত রোদন করিতেছেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া হারিয়া গিয়াছে। জননীর বুকভরা সমস্ত স্নেহ যেন অশ্রুরূপে তাঁহার সারা

দেহখানি নিঙড়াইয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি কাঁদেন, আর পরমেশ্বরকে গালি দেন। দুই দিন, চারি দিন, দশ দিন, পনের দিন কাটিয়া গেল। কর্ত্তা কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলেন, "আমরা 'একঘরে' হয়েই থাকব। কিন্তু কিরুকে চাই। তুমি তাকে আসতে লেখ—সে এখনি বাড়ী চলে আসুক; সে প্রাচিত্তির করবে, গোবর খাবে—সব করবে। তাকে আসতে লেখ।" বলিতে বলিতে তিনি তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, জটাধারী, বুড়োশিব প্রভৃতি দেবদ্বারে কত দিন কিরূপে ধন্না দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া বেলের কাঁটায় বক্ষ বিদ্ধ করিয়া কালীঘাটের কালীকে বুকের রক্ত দিয়াছিলেন, সেই পুরাবৃত্তের উত্থাপন করেন। কখনও বলেন—"কিরু জন্মাবার আগে ত জাত ছিল, কৈ তখন ত কিরু হয় নাই? আজ কিরুকে ছেড়ে জাত রাখতে যাব? কেন?"

স্নেহ,—জাতি সংস্কার ও ধর্ম্ম, সবার দাবী উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সমাজ করিবে কেন? সমাজ যদি জননীর হৃদয়ের একবিন্দুও পাইত, তবে এই পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইত। যাহাই হউক, নগেনবাবু ব্রাহ্মণদেরই শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি ব্রাহ্মণেরা তখন তাহার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু 'ব্রাহ্ম হইয়াছে' এই কথাতেই, এবং নগেনবাবু পর্য্যন্ত যখন জাতিনাশ আশঙ্কায় চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন সেই 'হওয়াটা'ই অবৈধতম এবং হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অমার্জ্জনীয়—এই ধারণায়, তাঁহারা মত দিলেন যে, এ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুর অজ্ঞাত, সুতরাং কীর্ত্তিকে কোনও রূপেই আর জাতিতে লইতে পারা যায় না। নগেনবাবু প্রথম হইতেই ব্যাপারটাকে যদি উড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এতটা গড়াইত না।

শাপমুক্তি

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নগেনবাবুর অন্তরটি যে কত আকৃষ্ট, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বাহিরের বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয় যে, তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু। যদি কোন একটা ভাল কায বা ভাল কথা পাঁচ জন লোকের অসাক্ষাতে হঠাৎ হইয়া যাইত, তবে যতক্ষণ তিনি সেটি সকলকে না বলিতে পারিতেন, ততক্ষণ তিনি বড়ই মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেন ; কিন্তু এমন ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিত না। বাহিরের উপর যে যত আসক্ত, সে তত করতালির ভক্ত। এই আত্ম-প্রচার অনেকটা উত্তেজনার ফলেও হয়, অনেকটা স্বভাবগুণেও হয়। ক্রমশঃ এটি যখন বেশ পরিপক্ব হয়, তখন বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হয়।

ত্রিশ বৎসর কাল হাকিমী করিয়া এবং হুকুম চালাইয়া নিজের নামের উপর তাঁহার একটা মমতা জন্মিয়াছে। গ্রামে মঞ্চহীন হইয়াও "পরম হিন্দু" বলিয়া তাঁহার যে একটা নাম হইয়াছে, ব্রাহ্ম পুত্রকে ঘরে আনিয়া তিনি সে নামটি মাটি করিতে শেষে একেবারেই ইচ্ছা করিলেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মত দিলেন না—তাঁহাদের বিপক্ষাচরণ করিতেও আর সাহস নাই, কেন না এখনও তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান। একে ত' তাঁহাকে গ্রামে আসিয়া সমাজে ঢুকিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, সে সবে এই দুই বৎসর হইল মিটিয়াছে। এখন পুত্রের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে গেলে কি জানি কি হয়,—নানারূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি জমিদার, বলপ্রয়োগে হাত বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু মুখ বন্ধ করিবেন কী করিয়া? হাত বন্ধ হইলে মুখ বেশী ফুটে। যদি এই সম ? ব্যাপার একবার পল্লবিত হইয়া রটে, তবেই

কন্যার বিবাহ ত' অসম্ভব হইয়া পড়িবে ; প্রজাগণের উপর বলপ্রয়োগে ও কুফল ফলিতে পারে, কারণ মন্দলোকের অভাব নাই—ইত্যাদি নানা-রূপ চিন্তা করিয়া শেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সব দিকই রক্ষা করিবেন, স্থির হইয়া গেল।

পুত্রকে পত্রে জানাইলেন যে, তাহার আর বাড়ী আসিবার দরকার নাই। তিনি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন। গৃহিণীকেও এ কথা জানাইয়া বলিলেন, "তোমার ত অনেক ছেলেই মরেছে, মনে কর কিরুও মরেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তি যখন পিতাকে তাহার দীক্ষা-গ্রহণের কথা লিখিয়াছিল, তখন সে ভাবে নাই যে পিতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন। সে যে কী আবেগে ও উত্তেজনায় ব্রাহ্ম হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই এখনও ঠিক জানে না; কীর্ত্তি ব্রাহ্ম হইয়া সুখী হইয়াছে, কি অসুখী হইয়াছে, তাহাও সে তলাইয়া বুঝিতে পারে নাই! তবে মোটামুটি সে বুঝিয়াছে যেন এই ধর্ম্মান্তরে সে তাহার ও তাহারা পিতা-মাতার স্নেহের মধ্যে একটা অনুল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠাইয়া দিয়াছে। এত দিন সে ছিল সবার পরিচিত, আত্মীয়দের ভিতর—আজ হঠাৎ সে বুঝিল—সে একা। পিতার পত্রে সে এমন অপ্রত্যাশিত কথা কখনও আশঙ্কা করে নাই বলিয়া তাহার অপ্রস্তুত হৃদয়খানি দুঃখে ও অভিমানে যেন অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পত্রপাঠ মাত্র সে একবারে পাথরের মত শক্ত হইয়া গেল। সে সব ভুলিয়া গেল। অতীত বিস্মৃত হইল, বর্ত্তমান ঠাওর করিতে পারিল না—

ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত ভাবনা গেল না। ভবিষ্যৎ একবারে নীরন্ধ্র অন্ধকার—কল্পনারও যাইবার মত এতটুকু ছিদ্র নাই। কলিকাতার শত শত দীপালোক পলকের মধ্যে নিবিয়া গিয়া, লক্ষ লোকের কল-কোলাহল যানযন্ত্র প্রভৃতির ঘর্ঘর শব্দ থামিয়া গিয়া—সে দেখিল, একটা প্রকাণ্ড শ্মশান, আর কীর্ত্তি তাহার মধ্যে একা।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তি প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, সে কোথায়? এই আশাময়ী মহানগরীতে সে যে কুকুর অপেক্ষাও হীন! এখানে উচ্চতম ঐরাবত এবং ক্ষুদ্রতম কীটেরও স্থান আছে—নাই কেবল তাহার। তাহার প্রধান চিন্তা হইল, পিতা যদি তাহাকে গ্রহণ না করেন, তবে সে কী করিয়া থাকিবে, খাইবে কী, কোথায় যাইবে? এই সমস্ত কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া কীর্ত্তি পিতাকে আবার এক পত্র লিখিল। স্বীকার-পত্রী সহ রেজেষ্ট্রী করিয়া দিল। পিতার স্বাক্ষরিত স্বীকার-পত্রী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পত্রের উত্তর আসিল না। প্রত্যহই প্রতীক্ষা করে, সে অভীপ্সিত পত্র আর আসিল না। তবু আশা ছাড়িল না। কীর্ত্তি ভাবিল, "মাসিক খরচ যাহা আসে, সেটা হয়ত নিশ্চয়ই আসিবে। কারণ, পিতা সাময়িক ক্রোধে বা লোকলজ্জায় কিছুদিনের জন্য আমায় ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু অনাহারে মরিতে বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে নিশ্চয়ই দিবেন না। বাবা যদি রাগিয়াই থাকেন, মা কোনো অন্যায় হইতে দিবেন না।

যথাসময়ে প্রভাত দেখা দিল সময় হইল, পিয়ন আসিল—চলিয়াও গেল; কিন্তু টাকা আসিল না। পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়া আশানুরূপ সদুত্তর না পাইয়া কীর্ত্তি পোষ্টাফিসে আসিয়া হাজির হইল। মনিঅর্ডার বাবু

কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন, "পিয়নের কাছে খোঁজ করুনগে। যদি টাকা এসে থাকে ত' সে নিয়ে আপনার বাসায় যাবে।" কীর্ত্তির চিন্তাপাণ্ডুর মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল—সে মুখ দেখিলে ডাকঘরের কেরাণীবাবুরও হয়ত একটু দয়া হইত। কীর্ত্তি তবুও আশা ছাড়িল না—ভাবিল, হয়ত কোনও কারণে পাঠান হয় নাই, এমন ত দুই একবার আগেও হইয়াছে। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেল টাকা আসিল না। অন্ধকারে হস্তচালনার মত সে আবার পত্র দিল—"আমি অনাহারে মরিতেছি—আমায় মেসের লোকে পুলিশে দিবে। শীঘ্র টাকা পাঠাইয়া আমায় রক্ষা করুন। যদি আর না দেন—এ মাসের খরচটা অন্তত দিন, আমি শোধ করিয়া দিয়া, নিজের পথ নিজেই স্থির করিয়া লইব।" তাহারও কোন উত্তর নাই।

এতদিনের রুদ্ধ আবেগ এবার ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় ও অভিমানে স্ফীত হইয়া, কীর্ত্তির সমস্ত অন্তরকে নাড়া দিল। কীর্ত্তি এবার সত্য সত্যই বিদ্রোহী হইল।

জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পঞ্চাশটি টাকা ধার লইয়া মেসের বাবদের তাগাদা হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু চলিবে কয় দিন? সে যে-ভাবে বরাবর খরচ করিয়া আসিতেছিল, সে অনুপাতে অনেক কমাইয়া দিল, তথাপি অর্থের অসচ্ছলতায় তাহার যে-ভাবে থাকা উচিত, সে ভাবটি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কীর্ত্তির খরচ কমাইয়া কষ্ট হইতে লাগিল, তবু লোকে বলিত—"বাবুয়ানার কম ত' কিছুই দেখচি না!" কীর্ত্তি বিশ পঁচিশ—যাহা হয়—বেতনের একটি চাকরী খুঁজিল—এমনি দুর্ভাগ্য, চাকরী একটিও মিলিল না। এ মাসও যায়-যায়! এমন

সময় সৌভাগ্যক্রমে সে একজন বিধবাকে বিবাহ করিল। এতদ্বারা কীর্তি একটা আশ্রয় পাইল—আপাতত তুইটি খাইতে পাইল। কীর্তি বাঁচিল। পিতার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য—বিবাহের কথা সে সবিস্তারে তাহার পিতাকে জানাইল।

কীর্তির পত্নীর নাম সরোজিনী! বেশ সুন্দরী, বয়স ১৬ কি ১৭। কীর্তির শ্বশুর শ্যামাচরণ রায়ও ব্রাহ্ম। ইনি কাশীতে ওকালতী করেন, জামাতাকে তিনি নিজ ব্যয়ে পুনরায় কলেজে ভর্তি করাইয়া দিলেন। কীর্তি বি. এ পাশ করিয়া কাশীরই একটি স্কুলে ৬০ টাকা বেতনে হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হিরণেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কোনও রূপ গোলযোগ হওয়া দূরে থাকুক, নগেনবাবুর সৎসাহস ও ত্যাগের জন্য বিবাহসভা ঘন ঘন করতালি ও উচ্চ প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কান্তি এখন কলিকাতায় এম্-এ পড়ে। একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে একজন বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে কান্তি কলিকাতায় থাকে. পাছে সেও আবার বিগ্ড়াইয়া যায়!

যে-জননী পুত্রের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। মৃতের জন্য মনে স্বতই একটা সান্ত্বনা আসে, কিন্তু পরিত্যক্তের জন্য সে সান্ত্বনা আসে কী? কোনও

বস্তু কাহাকেও দিলে দুঃখ হয় না, কিন্তু হারাইয়া গেলে দুঃখ হয়। পুত্রের শোকে জননী পাঁচ বৎসর কাল নানা পীড়ায় ভুগিলেন! চক্ষুর দৃষ্টি হ্রাস হওয়াতে ডাক্তার বলিয়াছে—কোনমতেই চোখে যেন আর জল না পড়ে; আর হৃদ্‌রোগের জন্য মনে স্ফূর্ত্তি রাখিতে স্বাস্থ্যকর দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা দিয়াছে। এই জন্য নগেনবাবু স্ত্রীকে লইয়া নানা তীর্থ ও সুন্দর সুন্দর শহর, যেমন দিল্লী, আগরা, জয়পুর, বরোদা, বম্বে প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। এই চর্ম্ম একদিকে কুসুম হইতেও যেমন সুকুমার, অন্য দিকে লৌহ হইতেও তেমনি সুকঠিন। চলিতে পায়ে বাজে, আবার তপ্ত লৌহশলাকার স্পর্শও তেমনি সহ্য হয়। শুধু একটা দাগ থাকে মাত্র। গৃহিণীর হৃদয়েও তেমনি একটা দাগ শুধু আছে—পূর্ব্বস্মৃতির লবণ-সংযোগ হইলেই সময় সময় সেটি জ্বালা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছয় মাস কাল যাবৎ নানা তীর্থ ও দেশ পর্য্যটন করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। উভয়ের মনের অবস্থাই অনেক ভাল। কিন্তু গৃহিণীর এ সংসার, এ সম্পদ, এ ঐশ্বর্য্য আর ভাল লাগে না বলিয়া তিনি কর্ত্তার নিকট প্রায়ই অনুযোগ করিতেন যে, "এই বার চল কাশীবাস করা যাক—সংসারধর্ম্ম ত আমাদের অনেকই হলো!" প্রথম প্রথম কর্ত্তা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া সংসার-ধর্ম্মেরই যৌক্তিকতা প্রয়োগ করিতেন—কখনও বলিতেন "কানু বি-এ, পাশ করুক—তার বিয়ে দিই, তার পর দেখা যাবে!"

কান্তি বি, এ, পাশ করিল। খুব সমারোহে কান্তির বিবাহও হইয়া

গেল। কর্ত্তা কায কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু গৃহিণী বিবাহের পর হইতেই যেন অধিকতর বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। যে আসিত তাহাকেই বলিতেন, "কিরু যদি আমার আজ ভাল থাক্‌ত, তবে তার কত ছেলে-পিলে হ'ত। আজ তার আমার ঘরে বাইরে ছুটাছুটি করে' এই নীরব পুরীকে সতত মুখরিত করে রাখতো।"

কর্ত্তার আর ওজর নাই। কাশী যাওয়াই স্থির। বিষয় পত্র বন্দোবস্ত করিতে আরও ছয়মাস কাটিল। সত্য-সত্যই একদিন প্রভাতে একটি দাসী, একটি ভৃত্য ও একটি পাচক সঙ্গে লইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী কতক হর্ষে কতক বিষাদে, কতক ত্যাগে ও কতক মুক্তির দুঃখ-সুখে কাশী রওনা হইলেন। সেদিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উষা। সূর্য্য তখনও উঠে নাই-- পশ্চিম গগনে জমাট একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত গত রাত্রের পূর্ণচন্দ্র মলিনাভ হইয়া বিদায়ের পূর্ব্বে ভাল করিয়া একবার পৃথিবীকে দেখিয়া লইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নগেনবাবু বাঙ্গালীটোলায় একটি ছোট ত্রিতল বাড়ী ভাড়া লইলেন। বাড়ীখানি ছোট হইলেও ঘর ছিল অনেকগুলি। খুব সামান্য গলি ভাঙ্গিয়া আসিলেই একেবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে উঠা যায়। বাড়ীর আশে পাশে অনেকগুলি পিতলের বাসনের দোকান, দুই একখানি ময়রার দোকানও ছিল।

প্রাতে মণিকর্ণিকায় স্নান ও আহ্নিক, স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন, সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন এবং অবকাশকালে হরিনাম জপ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে একরূপ বেশ নিশ্চিন্তেই কাশীবাস করিতে লাগিলেন।

পুনর্শ্মিলন

নগেনবাবুর বাড়ীর দক্ষিণ ধারে গরাদে দেওয়া একটা বড় জানালা ছিল। গৃহিণী এই জানালায় বসিয়া হরিনাম করিতেন, এবং যখন অবসর পাইতেন তখনই স্থানটিতে আসিয়া বসিতেন। এখানে বসিয়া তিনি চানাচুরের ডালা, বাসন বিক্রয়ের ঝাঁকা, খাবারওয়ালার মিষ্টান্নশোভিত বারকোশ, একা গাড়ীর ছাদ যেমন দেখিতেন, নানাবিধ বোলচালও তেমনি শুনিতেন। আর দেখিতেন একটি ৩।৪ বৎসরের শিশু রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করে। বালকের পরিধানে একটি নিকার-বোকার, পায়ে ফুল মোজা ও বুট, মাথায় কখনও কখনও একটি On. H. M. S. লেখা নীল রঙের টুপী। বালকটি গৌরবর্ণ, তার নাকটি বেশ দাঁড়াল', চোখ দুটি বড় বড় টানা টানা, হাসিখানি বেশ খদ্‌খদে', ছেলেটি বেশ শান্ত সুবুদ্ধি, দাইয়ের কাছ ছাড়া দূরে যায় না, দাই ডাকিলেই কাছে আসে। ছেলেটি বড় সুন্দর। ইহাকে দেখিতে দেখিতে গৃহিণীর মনে কত কথা, কত ভাব, কত স্মৃতি, কত মূর্চ্ছনার তরঙ্গ বহিত! মনের এ তোলাপাড়া একান্ত নিজস্ব বলিয়া যেন সে সব অব্যক্ত, অবচনীয়। এ যেন সুখ, এ যেন বেদনা। চৌধুরী-গৃহিণী এ সবের মীমাংসা কিছুই করিতে পারিতেন না যদিও, তবু ইহাতে তিনি খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। আজীবনের জননী-সেবাপরায়ণ, চিরদিনের জননী-স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানি আজ এই ক্ষুদ্র অপরিচিত শিশুটির নিকটে এক বিরাট, সুন্দর এবং অপূর্ব্ব মাতৃত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নিজের অসীম কুলহীন নিজস্বটি দান করিয়া সার্থক হইতে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তিনি শিশুটিকে বেশী করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কোটরগত নয়ন দু'টি যেন ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিত। এ চক্ষের

দৃষ্টি কত তৃষাতুর, কত বুভুক্ষু তাহা আর কেহই জানিত না। প্রত্যহ সকাল-সাঁঝে গৃহিণী জানালায় বসিয়া বালকের ছুটাছুটি, হাততালি, অট্টহাস্য, নৃত্যভঙ্গী অতিশয় মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। বালক যখন তাহার হিন্দুস্থানী দাসীকে চুম্বন দিত—দাসী তাহার মুখ বাড়াইয়া দিত, তখন কি জানি গৃহিণীর ওষ্ঠযুগলও এই দূর ব্যবধানেও সেই তালের সহিত সমতালে স্পন্দিত এবং প্রসারিত হইয়া উঠিত।

গৃহিণীর অপরিচিত শিশুটির প্রতি এই অযাচিত অদত্ত রুদ্ধস্নেহ কর্ত্তারও কর্ণগোচর হইল। নগেনবাবু বলিলেন, "সব ছেড়ে কাশী এসেছ, না?" গৃহিণী তখনি ছল ছল নেত্রে, একটু করুণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমার যে-সব জিনিস, তাই আমি ছাড়তে পারি আমি যার, তাকে আমি কি করে ছাড়ি বল দেখি?"

এক দিন গৃহিণী নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বড় ইচ্ছে, একবার ঐ ছেলেটিকে কোলে করে' কিছু খাওয়াই। ওই দেখ রাস্তায় ঐ বাসনও'লার দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চে; ডাক্‌বো?" বলিয়া তিনি জানালার দিকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া বালককে নির্দ্দেশ করিলেন। নগেনবাবু বলিলেন, "ও কে, কি জাত, কার ছেলে, কিছু জানি না—বাড়ীতে আন্‌বে, তা' পরে ওর বাপ মা যদি চটে যায়? ও সব কর্‌তে যেয়োনা, ঠক্‌তে হবে, অপমানিতও হতে পার।" গৃহিণী অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"তাও বটে, ধর যদি না-ই আসে!" বলিয়া একটি নাতিদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সে দিন গৃহিণীর গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে কিছু দেরী হইয়া গিয়াছিল। স্নানান্তে বাড়ী ঢুকিতেই তিনি দেখিলেন যে দাই সে ছেলেটিকে কোলে

করিয়া তাঁহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। পথে বড় ভিড়, কতকগুলি লোক বাজনা বাজাইয়া একটি শব লইয়া যাইতেছিল, তাই সে ইঁহাদের দুয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী-গৃহিণী আর প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, দাসীকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিলেন। দাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া মাইজী?"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "তুমি কোন বাড়ীতে থাক?"

দাসী বলিল,—"ঐ লাল বাড়ী যে আছে, সে বাড়ীতে হামি থাকে।"

"সেই বাবুর এ ল্যাড়্কা?"

"হাঁ, সেই বাবুর।"

"সে বাবু কি করেন? ও কি বাবুর নিজের বাড়ী?"

"আমার বাবু তো গুরু আছেন,—এ ছেলিয়া তাঁকর।"

বৃদ্ধা কি বুঝিলেন জানি না, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝিচি।"

দাসী বলিয়া চলিল—তাহার মুখ ফুটিয়াছে—"বাবুর বহু আছে, এই ছেলিয়া আর একঠো ল্যাড়কী ভি আছে। সে বহুৎ ছোটা।"

বালক দাসীর পিঠ ঠেলিয়া, যাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল, দাসী ধম্‌কাইয়া বলিল—"আরে, রঃ ত্বং মাৎ কর্।" বালক হতাশ হইয়া বৃদ্ধার মুখ পানে চাহিল। তিনি হাতের ভিজে কাপড়খানি উঠানে রাখিয়া বালককে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। বালক দাসীর কাঁধে মাথা রাখিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল! বৃদ্ধা বলিলেন—"ওমা এস এস,—লজ্জা কি?" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিলেন—বালক আরও দৃঢ়তর বেগে দাসীকে আঁকড়িয়া ধরিল। দাসী তাহাকে একটা নাড়া দিয়া বলিল—"যা যা,—মাইজী বোলাওয়ে।" বালক মুখ লুকাইয়া

খুব ছোট করিয়া বলিল, "নেই, তুই চল্।" দাসী বলিল, "নেহি যাবে মাইজী, বড়া বদ্‌মাশ।" গৃহিণী বালকের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, থাক্ থাক্!"

"আপনি হামাদের ডেরা চল্‌বেন? হামি তবে মাইজী কি বোল্ দেবে এখ্‌নি।"

দাসীর কথা শেষ হইতে না হইতেই গৃহিণী বলিয়া ফেলিলেন—"যাব যাব,— আজ দুপুর বেলাতেই যাব। তোমার মাইজীকে বলো। এমন সময় নগেন্দ্রনাথ বাটীতে প্রবেশ করিলেন, দাসী চলিয়া গেল।

নগেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে গ্রেপ্তার করে ফেলেছ দেখ্‌চি। তাই বুঝি আজ এখনো আহ্নিক পূজাও হয় নাই!" আহ্নিক পূজার কথা যে গৃহিণীর মনেই ছিল না! কি ভীষণ ভুল! তিনি যে, ওদের ঝিকেও ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন! ভাবিয়া তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে বলিলেন, "আজ দুপুরে আমি ওই বাড়ীতে যাব, দাইকে দিয়ে বলে দিলাম।"

নগেনবাবুরও ছেলেটিকে ভাল লাগে। অনেক সময় তাঁহারও মনে হইয়াছে যে একবার ওকে কোলে করেন, কিন্তু সে তাঁহার হয় নাই। তাই তিনি বলিলেন, "বেশ, যেয়ো, সে এখুনি তো আর নয়?" অন্য সময় বা অন্য কোথাও হইলে নগেনবাবু তাঁহার পত্নীকে বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও পাঠাইতে অপমান বোধ করিতেন এবং এরূপ জঘন্য প্রস্তাবের জন্য পত্নীকেও কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিতেন। হয় ধন্য কাশী, নয় ধন্য স্নেহ—অথবা উভয়ই ধন্য! নগেন্দ্রনাথ আর সে দাম্ভিক গর্ব্বিত নগেন্দ্রনাথ নহেন। কে তাঁহার আজ সে গর্ব্বে পদাঘাত করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"আমি সব কাজ-কর্ম্ম সেরে অনেকক্ষণ আপনার আশায় থেকে হতাশ হয়ে পড়লাম, ভাবলাম তবে বুঝি আর এলেন না—তাই কেবল উপরে যাবার জন্যে উঠ্‌ছি। দেখি আপনি এসে পড়লেন! গরীবদের ভোলেন নাই তবে।"

"না মা, ভুল্‌বো কি? সে কি কথা? আজ আমার সব কাযেই কেবল দেরী হয়ে যেতে লাগ্‌ল। যত মনে করি শীগ্‌গির কায সারি, ততই কাযের মুখে দ'পড়ে। অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে খাওয়া দাওয়া সব শেষ হয়ে যায়।"

"তা হয়, তাড়াতাড়ি কায কর্‌বো মনে কর্‌লে বেশী দেরী হয়েই যায় বটে।"

বলিতে বলিতে দুই জনে নীচে হইতে উপরের দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী-গৃহিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন একটি যুবতী। তাঁহার বয়স ২৩।২৪, বর্ণ টি বেশ মার্জ্জিত গৌর, কিন্তু অযত্নে কিছু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে! নাসিকার মধ্যস্থলটি একটু চাপা, চোখ দু'টি টল্‌টলে ভাসাভাসা—টানা—সুনীল। চিবুকাগ্রের সূক্ষ্মতায় যুবতীর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে। সুগৌর অরুণ মসৃণ গাল দু'খানি, হাসিতে গেলেই কুঞ্চিত দু'টি বিন্দু সৃষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য-সুষমার ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করে। মাথায় অবেণী-সম্বদ্ধ মুক্ত চিক্কণ কেশরাশি, অবগুণ্ঠনহীনতায় দুষ্ট শিশুর মত চোখে মুখে পড়িয়া যুবতীকে বড়ই উত্যক্ত করিতে লাগিল। পোষাকের মধ্যে পরিধানে একখানি কালা-পেড়ে ফরাস্‌ডাঙ্গার শাড়ী, তন্নিম্নে

একটি সাধারণ বাজারের শেমিজ। কানে দুইটি ইহুদী মাকড়ী, হাতে চারিগাছি করিয়া সোনার চুড়ী, বাম অনামিকা অঙ্গুলে একটি বগ্‌লস্ প্যাটার্ণের অঙ্গুরীয়। যুবতীর নাম সরোজিনী, সেই বালকের জননী।

বাড়ীটি খুবই ছোট। নীচে দুই খানি ঘর ও উপরে দুই খানি। নীচের একখানি ঘরে রন্ধনাদি ও অপরখানি স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরের দু'খানি শয়নকক্ষের যোগ্য, তন্মধ্যে একখানিকে বসিবার ঘর স্বরূপে ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহে আসবাব্-পত্র ও যৎসামান্য, কিন্তু তাহা সত্বেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—একটা মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। বসিবার ঘরটিও বেশ পরিসর। মধ্যে একখানি টেবিল, তাহার পার্শ্বে তিন খানি চেয়ার। টেবিলের উপরে কতকগুলি ঔষধের শিশি, আধখানা বেদানা, কিছু কিস্‌মিস্ —ও অন্য ধারে শ্লিপের মত ছোট ছোট কতকগুলি কাটা কাগজ এবং একটি দোয়াত ও কলম। প্রাচীর-গাত্রে কয়েকখানি ছবি—তন্মধ্যে একখানি মহাত্মা রামমোহন রায়ের, একখানি ভগবান্ যীশুর, একখানি একটা ব্যাঘ্র-শীকার, একখানি সমুদ্রের,—এইরূপ আরও কয়েকখানি। আর এখানে ওখানে কতকগুলি ফটোগ্রাফ্ও গৃহগাত্রে বিলম্বিত ছিল।

সরোজিনী চৌধুরী-গৃহিণীকে লইয়া এই বসিবার ঘরেই প্রবেশ করিল, কারণ যৎসামান্য আস্‌বাব পত্র যাহা আছে, তাহা এইখানেই। ঘরের উত্তর দিকে একখানি পালঙ্কে একটি রোগী। রোগীকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, কেবল কতকগুলি চর্ম্মাবৃত অস্থিপঞ্জরের সমষ্টি। আকণ্ঠ একখানি

সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল মুখটি খোলা। মুখের মধ্যে কেবল দাড়াল' নাকটি ও কোটরগত চক্ষু দুইটি ছাড়া সহসা আর কিছুই নজরে পড়ে না। অর্দ্ধবর্ষ ধরিয়া মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া পরাজিত না হইয়াও পরাজিত,—এতই ক্লান্ত, এতই ক্ষীণ, এতই শুষ্ক হইয়া সে পড়িয়াছে!

ঘরে ঢুকিয়াই দক্ষিণ দিকে পাতা একটা শতরঞ্জে দুইজনে গিয়া বসিলেন। যুবতী বেশ হাস্যময়ী,—সরল ও অকুণ্ঠ। এই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গৃহিণীর সঙ্গে সরোজিনী সহজভাবে কথা ফাঁদিতে পারিয়াছে। সরোজিনীর বড় একটা কু-অভ্যাস আছে যে, সে সর্ব্বদাই হাসে, এবং কোন কথা সে পেটে রাখিতে পারে না; এই জন্য অনেক সময় সে তাহার সঙ্গিনীসমাজের গুপ্ত মন্ত্রণাদিতে যোগদান করিতে পাইত না,—অনেক আবেদন নিবেদন শপথ করিয়াও না। ছয়মাস আগেও এইরূপ ছিল। এখন কিন্তু সে যেন পদে পদে ব্যাঘাব্যাহত হইয়া থাকে। সরোজিনী লোকের কাছে তবু ব্যথিত বলিয়া ধরা দিতে চায় না; সে শুধু হাসির প্রলেপে প্রাণের ক্ষতকে লোক-লোচনের অন্তরালেই চিরকাল লুকাইয়া রাখিতে চায়।

সরোজিনী যেমন গৃহিণীকে ধরিয়া জোর করিয়া বসাইল, অমনি গৃহিণী বলিলেন, "মা তোমার খোকা কই? সেই তো আমাকে এখানে এনেছে।" সরোজিনী বলিল, "আপনি আসবেন বলে আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, নইলে বড় ত্যক্ত করবে। আপনার বুঝি তাকে খুব ভাল লাগে?" গৃহিণী বলিলেন—"ভাল লাগে আবার বল্‌ছো? তাকে দেখ্‌লে যে আমি সব ভুলে যাই, মা। আমার মনে হয়, আমি তাকে সারাদিন কাছে রাখি।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ, এইবার হ'তে রাখ্‌বেন।" রোগী এই সময় দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। গৃহিণী এদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিলেন।

অনেক কথা হইল। যুবতী যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—তাহার স্বামী কাশীর একটি এণ্ট্রান্স্‌ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার; তাঁহার পিতা এখানে ওকালতী করিতেন, বাড়ী কলিকাতায়। ইঁহারা ব্রাহ্ম। যুবতী শ্বশুরালয়ে কখনও যান নাই, শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহাদের পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন; তাঁহাদেরও অবস্থা খুব ভাল। সম্প্রতি ইঁহাদের অর্থকষ্ট খুবই বেশী; কারণ একে এই দীর্ঘ কাল রোগীর চিকিৎসা, তার উপর একটি ছেলে একটি মেয়ে, এই বাড়ী ভাড়া, ঝি প্রভৃতির বেতন, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতেছে না। সরোজিনীর দুই ভা'য়ে মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য করেন—তাঁহারা কলিকাতায় উকীল, তাই কোনও রকমে দিন কাটিতেছে, নচেৎ রোগীকে হাঁসপাতালে দিয়া পুত্রকন্যা দু'টিকে লইয়া দ্বারে দ্বারে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইত।

যুবতীর হাসি অভ্যাস। সে হাসিতে হাসিতেই এই করুণ কাহিনী বিবৃত করিল। এ হাসি যে কি গরিমাময়, কি বেদনাপূর্ণ, কি সুন্দর, তাহা যাহারা হাসিমুখে বেদনা সহ্য করিতে পারে, তাহারাই বুঝে! বৃদ্ধা আগাগোড়া অশ্রুজলেই এ ইতিহাস শুনিলেন। এমন সময়ে কন্যাটি উঠিল; যুবতী তাহাকে আনিতে কক্ষান্তরে গেল; বৃদ্ধা তখনও ঝাপ্‌সা চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রোগীর পানে চাহিতেই চারি চক্ষু এক হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে দুইজনের পানেই চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া যখন পুনর্ব্বার চাহিলেন তখন রোগী এদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়াছে।

যুবতী রোরুদ্যমানা কন্যাকে লইয়া আসিল মেয়ের বয়স দেড় বৎসর। যেখানে বসিয়াছিল, সরোজিনী আসিয়া পুনরায় সেইখানেই বসিয়া কন্যাকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। বৃদ্ধা তখন সংক্ষেপে আপনার বাড়ীর কথা পাড়িলেন। সব কথা ছাড়িয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে, অর্থাৎ কীর্ত্তিকে কি করিয়া হারাইয়াছেন তাহাই বলিতে লাগিলেন! কীর্ত্তিকুমার নাম শুনিবামাত্র সহসা যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্ত, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—চৌধুরী-গৃহিণী তাহা লক্ষ্য করিলেন। ঠিক এই সময় ঘড়িতে চারিটা বাজিল—যুবতী রোগীকে ঔষধ দিতে গেল, আর সেই বালক এক হাতে একটি রবারের বল্ ও অন্যহস্তে একটা ভাঙ্গা লাঠি লইয়া খালি পায়ে ধীরে ধীরে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া বালক একটু লজ্জিত হইল, ডাকিল, 'মা"। মা বলিল—"যাও বোন্‌টিকে খেলা দাওগে, আমি যাচ্ছি।"

বালক নীরবে শতরঞ্চীর উপর শায়িত ক্ষুদ্র ভগ্নীটির কাছে আসিয়া বসিল। গৃহিণী ডাকিলেন, বালক কাছে গেল। বৃদ্ধা অজস্র চুম্বন-ধারায় বালকের মুখমণ্ডল ছাইয়া দিলেন।

ঔষধ দিয়া যুবতী চুপে চুপে স্বামীর সহিত কি একটু কথা কহিয়াই চলিয়া আসিল।

যুবতী ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা তাহাকে বসিতে না বসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়, তবু নাম তো শুনেছ।"
যুবতী বলিল—"নদে জেলার মঙ্গলগ্রাম।"

শুনিয়াই বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসম্বদ্ধ বস্ত্র ও চোখ-মুখের উন্মাদ দীপ্তিতে বালক ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণীর সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; তিনি ডাকিলেন—"কিরু"—"কিরু"—সে স্বর কী তীব্র, কী মধুর!

রোগী বস্ত্রমধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল "মা—মা"।

গ্রন্থকারের অন্যান্য লেখা

সুন্দরী	(উপন্যাস)	২৲
পঙ্কজিনী	(গল্পগ্রন্থ)	১।০
মীরাবাঈ	(নাটক মনোমোহনে অভিনীত)	১৲
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি		২৲
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ	(পরিবর্দ্ধিত ২য় সং যন্ত্রস্থ)	॥০
মন্দিরা	(কাব্যগ্রন্থ ২য় সং)	॥৵০
খঞ্জনী	(ঐ) (ঐ)	।৵০
পত্রচিত্র	(ঐ)	৸০
পঞ্চপাত্র	(ঐ)	৸০
সপ্তস্বরা	(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)	১৲

চিত্র ও চিত্ত

গাথাকাব্য

কবির নবতম অবদান—

রবীন্দ্রনাথের "কথা" ও "কাহিনী"র পর এরূপ গ্রন্থ আর বাহির হয় নাই—মূল্য ১৲

কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ও ৪৫।১এ বীডন্ ষ্ট্রীটস্থ **দীপালী** কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

দীপালী

১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ বর্ষারম্ভ—সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প এবং

সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের একমাত্র সচিত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র—

বহুল-প্রচারিত—ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত—

শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ শিল্পী ও লেখক লেখিকাগণের রচনায় সুসমৃদ্ধ

দেশ বিদেশের গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পীদের অপ্রকাশিত চিত্রে সুশোভিত

দেশ বিদেশের নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ

নির্ভীক সমালোচনা ও অমুখাপেক্ষী মত প্রচারে সুপ্রতিষ্ঠিত

মহিলা ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রিয় ও পৃষ্ঠপোষিত

ডবল ক্রাউন ৪ পেজী আকারে

বাংলার একমাত্র

সচিত্র সাপ্তাহিক

সপ্তাহে ২৪ পৃষ্ঠা, মাসিক ৯৬ পৃষ্ঠা

—সাধারণ মাসিকপত্রের ১৯২ পৃষ্ঠার সমান—

নগদ মূল্য ৵০—সডাক বার্ষিক ৮৲

এ বৎসর দুই খানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে ও প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোট গল্প ছাড়া বহু কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনা ব্যঙ্গ কৌতুক ও রস-রচনা নিয়মিত থাকিবে।

শীঘ্রই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

ম্যানেজার—**দীপালী**

৪৫।১।এ বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের নূতন গল্পের বই

মডার্ণ গৌরী

দাম এক টাকা।